জন সম্রাট

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ইস্টলাইট বুক হাউস

প্রথম প্রকাশ : প্রজাতন্ত্র দিবস : ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫৬

প্রকাশক :—
শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী
ইষ্টলাইট বুক হাউস
২০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
কলিকাতা—১

মুদ্রক :—
শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী
লয়াল আর্ট প্রেস, লিঃ
কলিকাতা—১৩

প্রচ্ছদ ভূষণ :— আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই টাকা আট আনা

পরিমল গোস্বামী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আন্তরিক স্নেহে যিনি একদিন

অসংখ্য পাঠকের সংগে

পরিচিত হবার

সুযোগ

দিয়েছিলেন

: রচনাকাল :

জুন ১৯৫৫

থেকে

২৩শে জানুয়ারী ১৯৫৬

সোমবার সন্ধ্যা : কলিকাতা

: এই লেখকের অন্যান্য বই :

অন্য নগর (২য় সংস্করণ)
এই মর্তভূমি ,,
দূরের মিছিল ,,
মনে মনে ,,
মুখর লণ্ডন ,,
ছায়া মারীচ ,,
নতুন বাসর
ইভনিং ইন্ প্যারিস
ব্যালেরিণা (যন্ত্রস্থ)
বিপাশা ,,

এক

এমন ক'রে চলে না। এমন ক'রে চালানো যায় না। তবু চালিয়ে নিতে হয়। উপায় কী? উপায় নেই।

মাঝে মাঝে আজকাল সুলতার শরীরে ভয়ের শিহরণ খেলে যায়। ভবিষ্যতের জমাট অন্ধকারের কথা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারে না। কোথাও এতোটুকু আলোর রেখা নেই। ম্লান সংসারে দিনের পর দিন শুধু প্রয়োজন বাড়ে কিন্তু উপার্জন বাড়ে না।

তবু কোনোদিন সুলতা এমন ক'রে দিশা হারায়নি। নিজের কথা ভেবে কোনোদিন কমলেশের সংগে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করেনি—তাকে শান্তিতে কাজ করবার প্রচুর সুযোগ দিয়ে এসেছে এতোদিন।

কিন্তু এখন শুধু সুলতার নিজের কথা ভাবলে চলে না, স্বামীর কথা ভেবেও নিশ্চিন্ত হ'য়ে চুপ ক'রে বসে থাকলে হয় না। তাকে সব চেয়ে আগে মেয়ের কথা ভাবতে হয়। শীলা দেখতে এমন কিছু ভালো নয়। অতি সাধারণ বাঙালী মেয়ের মত চেহারা তার। আর কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে কলেজে ভর্তি করতে হবে। চেহারা যখন খুব ভালো নয়, আর এখনই যখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না তখন তাকে পড়াশুনো করতেই হবে। একটা কিছু না করলে চলবে কেন। কিন্তু যেমন মানুষ কমলেশ, তার এসব কথা ভাববার সময় হয় না। শীলা কলেজে পড়বে কিনা, আর পড়লে খরচ চলবে কেমন ক'রে—এ সব কথা ভাবতে ভাবতে আজ কয়েক দিন থেকে সুলতার মাথার ঠিক নেই।

আগে এ সব কথা এমন ক'রে কোনোদিনই ভাবতো না সুলতা। বরং সে মনে মনে অনেক স্বপ্ন রচনা করেছিলো। সে ভেবেছিলো না-ই বা থাকলো তার স্বামীর বাঁধা ধরা উপার্জন, হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন টাকা রাখবার জায়গা পাবে না সুলতা। আর তার স্বামীর যা আছে তাই বা ক'জনের থাকে। তার স্বামীর নাম সকলে জানে, তাকে সম্মান করে কতো লোক। ক'জন মেয়ের এতো সৌভাগ্য হয়!

আজ সব কিছুই কচি বয়সের কল্পনা বলে মনে হয়। বিয়ের পর প্রথম প্রথম বুক ভ'রে উঠেছিলো সুলতার। কমলেশের মতো মানুষ হয় না। সুলতার মনে হতো প্রত্যেক পুরুষের এমনি হওয়া উচিত। ছোটো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কমলেশ কখনও মাথা ঘামায় না, সংসারের কোনো দিকে তার চোখ নেই, কোনো কিছুতেই তার লোভ নেই। সুলতা খুব অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারলো তার স্বামীর মনে কোনো দৈন্য নেই। কমলেশের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভ'রে উঠলো। আর তার নিজের মনে যে সংকীর্ণতা ছিলো স্বামীর সংস্পর্শে এসে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে নিজেও যেন তা থেকে মুক্ত হ'লো।

হয়তো আজও সুলতার মনে কোনো দৈন্য নেই, আজও স্বামীর ওপর তার শ্রদ্ধা একতিলও কমেনি। কিন্তু আজকাল কমলেশের সংগে কথা বলতে বলতে তার মাথায় সহসা যেন আগুন জ্বলে ওঠে আর মনে হয় সংসারের এই অভাবের জন্যে সেই দায়ী। সে কোনোদিন কারোর কথা ভাবেনি, কারোর দিকে চোখ তুলে তাকায়নি, এমন কি, মেয়ের ভাবনা ভাববারও সময় পায়নি। শুধু নিজের কথা ভেবে এসেছে এতোদিন।

ভাবতে ভাবতে মাথায় হাত দিয়ে সুলতা ব'সে পড়ে, ভারী কান্নায় সে যেন ভেঙে পড়তে চায়। দু দিন পরে কোথায় দাঁড়াবে সে, মেয়েকে নিয়েই বা করবে কী। একটি পয়সাও সঞ্চয় নেই, কোনো ফাঁক দিয়ে

কোনো অর্থ আসবারও সম্ভাবনা নেই। সে কিছুতেই ভেবে পায় না কেমন ক'রে সারা মাস চালাবে।

মাসের প্রথম থেকে শেষ অবধি ভাবনায় ভাবনায় তার প্রতি মুহূর্ত কাটে। বাড়ি ভাড়া, বাজারের খরচ, চাকরের মাইনে—এ সব ছাড়াও শীলার জন্যও খরচ আছে। নিজের কথা না হয় না-ই মনে করলো সুলতা। এসব কথা কবে বুঝবে কমলেশ! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে সুলতার। সে সোজা কমলেশের পাশে এসে দাঁড়ায়।

কমলেশ তখন খুব মন দিয়ে কি যেন লিখছিলো। মাথা না তুলে বললো, কী সুলতা?

সুলতা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছু বলতে পারলো না। সেই এক কথা বার বার বলতে তারও আর ভালো লাগে না। এতোদিন ব'লে যখন কোনো ফল হয়নি তখন আজও যে হবে না তা সে জানতো। তাই কতগুলো অস্বস্তিকর মুহূর্ত আসবে মনে ক'রে ইতস্তত করছিলো।

কমলেশ জানতো সুলতা কী বলবে। তাই তার দিকে তাকিয়ে হেসে সে বললো, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, এই বইটা শেষ ক'রে নি—

অনেক বই তো শেষ হ'লো, আরও অনেক যে শেষ হবে তা'ও জানি, স্বরে বিরক্তি যথাসম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা ক'রে সুলতা বললো, আমি নিজে সারা জীবন ধ'রে অপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু শীলা?

কমলেশ হেসে বললো, শীলাও অপেক্ষা করবে।

দৃঢ়স্বরে সুলতা বললো, না। ও কথা তুমি আর কোনোদিন আমার সামনে ব'লো না—

সুলতার কঠিন স্বর শুনে কমলেশ অবাক হ'লো না। এমনি ক'রে সে আজকাল তার সংগে প্রায়ই কথা বলে। স্ত্রীর কোন দোষ দেখতে পায়না

কমলেশ। অভাবে মানুষের সব কিছু পরিবর্তন হ'তে পারে তা সে ভালো ক'রেই বিশ্বাস করে। তবু সে ভেবেছিলো এই পৃথিবীতে অন্তত একটি-মাত্র মানুষ কোনোদিন তার কোনো কিছুতেই বিরক্ত হবে না। সুলতার কথাই সে অবশ্য মনে করেছিলো।

শূন্য দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কমলেশ বললো, তাহ'লে কী কথা বলবো ব'লে দাও ?

আমি ভাবতে পারিনি এতোদিন পর তুমি আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবে—

কমলেশ আবার হেসে বললো, সুলতা, আজ সকালবেলা তুমি কী আমার সংগে ঝগড়া করবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছো ?

না, ওগো তুমি দয়া ক'রে আমাকে ভুল বুঝো না। সত্যি বলছি আমি আর কিছুতেই চালাতে পারছি না। তুমি যা হয় একটা ব্যবস্থা কর। শীলা পাশ করেছে, ওকে কলেজে ভর্তি করতে হবে। ওর খরচ দিনে দিনে বাড়বে। কী ক'রে আমি পারবো বলো ?

সত্যি কথা। সুলতা কী ক'রে চালাবে ? কমলেশই বা কী বলবে তাকে! শুধু ব'লে বুঝিয়ে আর কতোদিন চলবে। তবু সুলতার মতো কমলেশ বিচলিত হয় না। এমন কি, নিজের সংসারের কথা নিয়ে সে বেশিক্ষণ ভাবতেও পারে না। সুলতা যখন মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে তাকে এমনি নানা রকম অভাবের কথা বলে যায় তখন সে তার প্রত্যেকটি কথা শোনে বটে, কিন্তু সুলতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর মুহূর্তে তার বলা কথাগুলি ভুলে যায়। তুচ্ছ অভাব অসুবিধার কথা কমলেশের সত্যকে একতিলও টলাতে পারে না। বাইরে দৈন্য সে সহ্য করতে পারে, তা সে যতো কঠোর হোক না কেন, কিন্তু কোনোদিন তার মনে যেন সামান্য দৈন্য না দেখা দেয়। তা'হলে একেবারে ক্ষয়ে যাবে সে, বন্ধ হয়ে যাবে তার সৃষ্টি।

সুলতা, কলম বন্ধ ক'রে টেবিলের ওপর রেখে কমলেশ বললো, আমরা কি-ই বা এমন খারাপ আছি? দু' বেলা পেট ভ'রে খেতে পাচ্ছি, পাঁচ জনের স্নেহ ভালবাসা পাচ্ছি আর মনে আমাদের তেমন কোনো দুঃখও নেই। তুমি এমন ক'রে ভেবে শরীর খারাপ কর কেন?

সুলতা জানতো তার স্বামী এমনি কথাই বলবে। এতোদিন ধ'রে এমন ক'রেই সে তার সংগে কথা বলে এসেছে। এ সব কথা একদিন তার ভালো লাগতো। সে জানতো হঠাৎ রাতারাতি কেউ বড়লোক হয় না, বিখ্যাত হ'তে গেলে অনেক দিন সাধনা করতে হয়। তাই স্বামীকে সে সব রকম সাহায্য ক'রে এসেছে। সংসারের ছোটো তুচ্ছ ব্যাপার তার কানে তোলেনি আর মাঝে মাঝে তুলতে বাধ্য হলেও তিনবার ভেবে, অনেকক্ষণ ইতস্তত ক'রে তবে বলেছে। তারপর নিরুপায় হ'য়ে অভাবের সেই পুরানো কথা বার বার বলেছে এবং অবশেষে সংসারের নানা অসুবিধার কথা ছাড়া স্বামীর সংগে আর কোনো কথাই বলেনি অনেকদিন।

অথচ আশ্চর্য, একদিনের জন্যেও কমলেশ তার কথা শুনে বিচলিত হয়নি, কিছু করাও প্রয়োজন মনে করেনি। চুপ ক'রে স্থির চোখে সুলতার দিকে তাকিয়ে শুধু তার কথা শুনে গেছে। তারপর কথা শেষ হ'লে উত্তরে সুন্দর ক'রে বারবার তাকে বুঝিয়েছে—একদিন দু'দিন নয়, বহুদিন বহুবার।

সুলতাও কমলেশের কথা শুনে আর কিছু বলতে পারেনি। তার মনে হ'তো সব দোষ যেন তার। কমলেশের মতো মানুষকে নানা দৈন্যের কথা জানিয়ে সে যেন তাকেও ছোটো করতে চায়। তারপর আবার অনেকদিন সুলতা চুপ ক'রে থাকতো। সে সব মানিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। দেখতে দেখতে স'য়ে গেল সব। সুলতা নিজের সব সাধ আহ্লাদের কথা ভুলে গেল। মনে মনে সে তার স্বামীর মতো হবার চেষ্টা করলো। কোন দিন কোনো কিছুর অভাব বোধ করবে না, কোনো কিছু চাইবে না, যা

আছে তাই থেকে সোনা ফলাবার চেষ্টা করবে। যদি কোনোদিন তার স্বামীকে সমস্ত দেশ চেনে তাহ'লে তার বুক ভ'রে যাবে, সেইদিন সব অভাব মুহূর্তে ঘুচে যাবে। তারই প্রতীক্ষায় আজকের সমস্ত দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে সহ্য করবে সুলতা।

কিন্তু এসব হলো অনেকদিন আগেকার কথা। ছেলে মানুষের মতো এমন সব কথা এখন আর সে ভাবে না। তার মেয়ে তাকে ভাবতে দেয়না। শীলা বড়ো হবার সংগে সংগে সুলতার ব্যাপক মন যেন ছোটো হ'য়ে আসতে লাগলো—এতো ছোটো যে মাঝে মাঝে সে নিজেই ভাবে এমন সাংঘাতিক পরিবর্তন তার হ'লো কেমন ক'রে। তাই থেকে থেকে কমলেশের কাছে কঠিন হ'য়ে উঠলেও স্বামীর উত্তর শুনতে শুনতে তার সব যেন গোলমাল হ'য়ে যায়।

তবু আজ সুলতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রে কমলেশের কাছে এসেছিলো। সে যা' বলুক না কেন, একটা কিছু না ক'রে এ ঘর থেকে সুলতা বেরিয়ে যাবে না।

তাই কমলেশের কথার উত্তরে আজ আরও কঠিন স্বরে সে বললো, কে বললো তোমাকে আমরা দু'বেলা খেতে পাচ্ছি?

কমলেশ হেসে বললো, তাই তো মনে হয়। কই, আমরা তো এখনও এক বেলাও উপোস করিনি।

তুমি উপোস না ক'রে থাকতে পারো, কিন্তু খবর রাখো তোমার সুবিধার জন্যে বাড়ির লোককে কতোদিন আধ পেটা খেয়ে থাকতে হয়?

সে কী কথা সুলতা?

সুলতা যেন এক নিশ্বাসে যন্ত্রের মতো হঠাৎ বলে চললো, তোমার কাজের ব্যাঘাত হবে বলে তোমাকে স্পষ্ট করে সব কথা কখনও বলিনি। এতোদিন চোখ বুজে আমি শুধু তোমাকে অনুসরণ ক'রে এসেছি। ভেবে-

ছিলাম একদিন আমার সমস্ত দুঃখ তুমি ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু তুমি পাষাণ, তাই আজ থেকে আমার পাওনা আমি কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নেবার চেষ্টা করবো।

শান্ত সুরে কমলেশ বললো, বল কী চাও তুমি?

তোমার সংগে একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

তবু হাসলো কমলেশ তোমার সংগে আমার বোঝাপড়া এখনও কী শেষ হয়ে যায়নি সুলতা?

না, এইবার সুরু হবে। আমি তোমার কথায় যেমন ক'রে দিন কাটিয়েছি আমার মেয়ে কিছুতেই তেমন ক'রে কাটাবে না। সে ভালো ভাবে বাঁচবে, ওর বয়সী আর পাঁচজন মেয়ের মতো সুখে থাকবে। তারপর আমি দেখে-শুনে ওর ভালো বিয়ে দেবো।

কললেশ বললো, এতো তাড়াতাড়ি সেকথা নিয়ে এমন ভাবনা করবার কী দরকার? ওইটুকু তো মেয়ে শীলা—

ওসব কথা বলে তুমি আর আমাকে ভুলিয়ে রাখতে যেও না। ও মোটেই আর ছোটো মেয়ে নেই। এখন থেকেই ওর বিয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে—

অন্য জায়গায় চেষ্টা করবার দরকার কী? আমার তো মনে হয় বিকাশকে ওর খুব পছন্দ—

আমিও সেকথা জানি। কিন্তু ব্যবস্থা পাকা করতে গেলে খরচের দরকার। সে-টাকা কোথায়?

ততোদিনে হয়ে যাবে। তোমাকে কিছু ভাবনা করতে হবে না সুলতা—

কমলেশের কথা শুনে সুলতা যেন জ্ব'লে উঠলো, ছেলেমানুষের মতো কথা বলো না। সে-বয়স অনেকদিন পার হ'য়ে এসেছো। আর কতোদিন

এমন ছেলেখেলা করবে তুমি? আর কতোদিন আমাকে ভুলিয়ে শীলাকে ফাঁকি দিয়ে এই দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে রাখবে?

কমলেশ আস্তে আস্তে বললো, তোমার কাছ থেকে ঠিক এই ধরণের কথা আমি কোনদিন শুনবো ব'লে আশা করিনি সুলতা—

না। কারণ তুমিও কোনদিন আমাকে এসব কথা বলবার অবসর দাওনি। যখনই কিছু বলতে গেছি তখনই কথার মালা সাজিয়ে এমন সব আমাকে বলেছো যার উত্তর দেবার ভাষা আমি খুঁজে পাইনি—

আমি কী করতে পারি বল? তুমি যদি আমার কাছে ঐশ্বর্যের দাবী কর, আমি কোথা থেকে তা তোমাকে দেব?

ঐশ্বর্য্য! সুলতা মুচকি হেসে বললো, না সম্পদের দাবী আমি তোমার কাছে করছি না, কোনোদিনও করি নি। বাঁচতে হ'লে যেটুকু অর্থের প্রয়োজন, আমি তোমার কাছে ঠিক ততোটুকু চাচ্ছি—

এখন এর বেশি দেবার আমার ক্ষমতা নেই। সব জেনে শুনে তুমি যদি অবুঝ হও—

সুলতার সমস্ত শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠলো, কে অবুঝ? আমি না তুমি? এই এতো বছর কী অমানুষিক কষ্ট তোমার জন্যে সহ্য করেছি আমি। শুধু ভিক্ষে করতে বাকি ছিলো—আশা ছিলো অন্তত একদিন তুমি সংসারের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করবে—

কিন্তু সুলতা সময় শেষ হ'য়ে যায় নি। এখনও—

থামো! এইবার সুরু হবে সেই এক ঘেয়ে পুরানো কথা—আদর্শ সাহিত্য, সাধনা। বলতে পারো কী দিয়েছে এতোদিন আমাকে তোমার সাহিত্য? লজ্জা অপমান আর দারিদ্র্য। ঘেন্না ধরে গেছে সাহিত্যে—

কিন্তু হঠাৎ তুমি এতো অধীর হচ্ছো কেন?

লজ্জা করছে না জিজ্ঞেস করতে? তিল তিল ক'রে শুকিয়ে শুধু

আশার বড়ো বড়ো ফাঁকা কথা শুনে আর আমি প্রতিভার পুজো করতে পারবো না।

কিন্তু হঠাৎ আমি কী করবো বল? রাতারাতি আমি তো আর ব্যবসা আরম্ভ করতে পারি না—

জানি। তোমার সে ক্ষমতাও নেই। একটা মিথ্যা দম্ভ নিয়ে শুধু বাড়ির লোককে ভুলিয়ে রাখতে জানো তুমি।

না। আমি কাউকে ভুলিয়ে রাখতে চাই না। কিন্তু যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে আর সকলকে ভুলে আছে, যারা লক্ষ লোককে বঞ্চনা করে তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ ক'রে হাসি মুখে দিন কাটাচ্ছে, আমি আমার কাজের মধ্যে দিয়ে সেই বঞ্চিত লক্ষ লোকের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে চাই—

এমনি কথাই তুমি আমাকে চিরকাল ব'লে এসেছো, যার অর্থ আমি কোনোদিনও বুঝতে পারি না।

একদিন তুমি বুঝবে, হয় তো সেদিন আমি থাকবোনা। সেদিন তুমি বুঝবে যে সত্যি আমি তোমাদের কাউকে ফাঁকা কথায় ভুলিয়ে রাখতে চাইনি—যাদের দুঃখ আমার চেয়ে অনেক বেশি তাদের কথা ভেবে আমি নিজের সব দুঃখ ভুলেছিলাম।

আজ প্রথম নয়, সুলতা যখনই কমলেশকে সংসারের অভাবের কথা বলবার চেষ্টা করেছে, তখনই সে তাকে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠিক এমনি কথাই বলেছে। আর না বললেও চলে, এমন কথা শোনবার পর সুলতা আর কিছু বলবার ভাষা খুঁজে পায়নি। তার কথার খেই হারিয়ে গিয়ে সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। কাজেই আর কিছু না বলে মনে চাপা অস্বস্তি নিয়ে সে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে গেছে।

অন্য দিন হ'লে কমলেশের কাছ থেকে এ সব কথা শোনবার পর হয়তো সুলতা ঠিক তেমনি করেই চলে যেতো। আজ কিন্তু গেল না। আজ সে

স্বামীর সংগে একটা বোঝাপড়া করবেই। এমন কি, প্রয়োজন হ'লে কঠিন কথা বলতেও দ্বিধা করবে না।

তাই সুলতা বললো, এ সব কথা তোমার সংসারে আসবার পর থেকেই শুনে আসছি। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা ভুলে তুমি আর পাঁচজনের কথা ভাবতে পারো। কিন্তু আমরা? আমাদের কথা তুমি কেমন ক'রে বাদ দাও?

বাদ দিইনা সুলতা, গভীর স্বরে কমলেশ বললো, কিন্তু তোমরা যে আমার রক্তের মধ্যে মিশে আছো, তাই তোমাদের পর ব'লে ভাবতে পারি না।

তোমার কথা কোনো দিনও আমার কাছে পরিষ্কার হয় না। ওগো দয়া ক'রে এমন বাঁকা কথা আর তুমি ব'লো না। আমি যেমন সহজ ভাষায় তোমার সংগে কথা বলছি, তুমি কি কিছুতেই আমার সংগে তেমন ক'রে কথা বলতে পারো না?

তুমি যদি আমাকে বোঝবার সামান্য চেষ্টা করতে সুলতা তা'হলে আমার সব কথাই তোমার কাছে সহজ মনে হ'তো—

বাধা দিয়ে সুলতা বললো, এতোদিন সে চেষ্টা ক'রে আজ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। তোমার পায়ে পড়ি, এবার তুমি আমাদের একটু বোঝবার চেষ্টা কর। তুমি মহৎ, তুমি সকলের কথা ভাবো, সব ভুলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ জানাও—কিন্তু বলতে পারো আমরা তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি যার জন্যে তুমি চোখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকাতে পারো না?

সুলতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থেকে কমলেশ বললো, কবে তোমাদের দিকে না তাকিয়ে আমি চোখ ফিরিয়ে ছিলাম সুলতা? আমার সব চেয়ে কাছের মানুষ হ'য়ে তুমি আমাকে এমন ভুল বোঝো কেন?

কথায় তোমার সংগে আমি পারবো না, শুকনো গলায় সুলতা বললো, যতোবার আমি তোমাকে এসব কথা বলতে এসেছি ততোবার তুমি আমাকে শুধু কথা বলে থামিয়ে দিয়েছো। কিন্তু অনেক হয়েছে, তোমাকে আজ স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই তোমার মধুর কথায় কোনোদিনও আমাদের পেট ভরেনি—আজও ভরবে না।

কমলেশ অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলো না। সে নিঃশব্দে সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে রইল। তার কথা বলবার ভাষা হঠাৎ যেন লুপ্ত হ'য়ে গেছে। সে ভাবছিলো সত্যি এমন করে আর বেশিদিন চলবে না। যাদের সংগে সে বাস করে তাদের কাছ থেকেও যদি সে এতোটুকু সমবেদনা না পায় তা'হলে সে সামনে এগিয়ে যাবে কেমন ক'রে!

সুলতার একটা হাত ধ'রে কমলেশ বললো, আমার মনে হয় আজ অন্য কারণে তুমি উত্তেজিত হ'য়ে আছো—তুমি তো এমন ক'রে কোনো দিনও আমার সংগে কথা বলনি?

না, আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা আছে। আমি অনেকবার তোমাকে ঠিক এমনি কথা বলতে এসেছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে কিছুই বলতে দাওনি—

আহত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কমলেশ বললো, আমি তোমার ভুল ভেঙে দিতে চেয়েছিলাম সুলতা—

আঃ, ওসব কথা তুমি আমাকে দয়া করে আর বলো না, স্বামীর কথা শুনে সুলতা উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, কিসের ভুল? কাদের ভুল ভাঙতে চাও তুমি?

কমলেশ শান্ত স্বরে উত্তর দিলো, আমার কাজের মধ্যে দিয়ে তোমাকে এই কথাটাই বোঝাতে চাই যে শুধু তুমি আমি আর শীলা প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে থাকলেই জীবনে চরম তৃপ্তি আসবে না সুলতা—যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চারপাশে কতো অসংখ্য লোক আমাদের চেয়ে অনেক দুঃখ যন্ত্রনার

মধ্যে আছে তখন তাদের কথা ভুলে আমি শুধু আমাদের কথা ভাবতে পারবো না। তুমি জানো আমার যা কাজ তা' ভালো ক'রে করতে গেলে সব চেয়ে আগে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে হয়।

বাঃ, কী চমৎকার যুক্তি তোমার! তুমি নিশ্চয়ই যা ইচ্ছে তাই করতে পারো কিন্তু আমরা কেন এই কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে প'ড়ে থাকবো? তোমার কাজের সংগে আমাদের কাজের অনেক তফাৎ তা'তো জানোই।

জানি। তা'হলেও একমাত্র তোমারই কাছ থেকে আমি গভীর সমবেদনা আশা করি। কারণ আমার বিশ্বাস, যদি আমি তা থেকে বঞ্চিত হই তা'হলে হয়তো আমারও কাজ বন্ধ হ'য়ে যাবে—

হয় হোক। সারা জীবন কাজের দোহাই দিয়ে তুমি আমার সুখশান্তি হরণ করে নেবে, এ আমি আর কিছুতেই সহ্য করবো না। অমন কাজ না করলে কী হয়? যে কাজ শুধু সংসারে অভাবের বেড়াজাল পেতে রাখে? আর ধারে কাছে যারা থাকে তাদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়?

হতাশ চোখে সুলতার দিকে কমলেশ বললো, সুলতা, তোমার মুখ থেকে আমি যে এমন কথা শুনবো তা' স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

আমিও ভাবতে পারিনি তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে আমাকে এমনি ক'রে জীবন কাটাতে হবে। মেয়েটার দিকে আমি তাকাতে পারি না জানো? কতোই বা ওর বয়স। তোমার বিরাট কাজের জন্যেও বেচারীকেও সন্ন্যাসীনির মতো দিন কাটাতে হচ্ছে। একটা গয়না নেই ওর, একটা ভালো শাড়ি নেই। ওর বয়সী মেয়েরা কতো ভালো ভালো শাড়ি গয়না পরে, তাদের দেখে ওর যখন অমন পরবার সাধ হয় আর আমার কাছে এসে বলে, মা হ'য়ে আমি তখন ওকে তোমার মহান কাজের কথা ব'লে ফাঁকি দিই—ভুলিয়ে রাখি। কিন্তু আর পারবো না, তোমার জন্যে আর এক তিল স্বার্থ আমি শীলাকে ছাড়তে দেবো না।

তুমি অন্যায় করছো সুলতা. কমলেশ দৃঢ়স্বরে বললো, শীলাকে সম্পদের লোভ দেখিয়ে তার মন ছোটো ক'রে তুলো না। কই ও নিজে তো কোনদিন এসব কথা ভাবে না কিংবা বলে না ?

শ্লেষের হাসি হেসে সুলতা বললো, কারণ ও এসব কথা বলবার সুযোগ পায় না। বুঝতেই তো পারো ফাঁকা কথা ব'লে ওর বয়সী মেয়েদের ভুলিয়ে রাখা কতো সোজা। কিন্তু তুমি যাই বল না কেন, আমি ওর চোখ খুলে দেবো। জীবনের একেবারে প্রথম থেকে কিছুতেই আমি ওকে আমার মতো ঠকতে দেবো না।

কে বললো তুমি ঠকেছো সুলতা? আমি জানি তোমাকে অনেক সাধ আহ্লাদ ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু এটা তো ঠিক কারোর কাছে কোথাও তোমার মাথা একদিনের জন্যেও নিচু হয় নি, কী ভেবে কমলেশ বললো, আমি আজ যে কাজ করছি তা না করে যদি মদ খেয়ে দিন কাটাতাম আর তোমাদের সব সুখ থেকে বঞ্চিত করতাম তা হ'লে কী হ'তো ?

সংগে সংগে সুলতা উত্তর দিলো, তা হ'লেও আশা থাকতো। ভাবতাম তুমি একদিন মদ ছেড়ে দেবে, আর তাহ'লেই আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে—

কমলেশ হেসে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী ধারণা আমি লেখা ছেড়ে দিলে তোমার সব দুঃখ ঘুচে যায় ?

বোধ হয় যায়। অন্তত তাহ'লে তোমার নিজের ধারণা বদলে যেতে পারে। তুমি আর পাঁচজন মানুষের মতো নিজের সংসারের দিকে ফিরে তাকাতে পারো।

ভুল কথা সুলতা এক মুহূর্তের জন্যেও আমি তোমাদের কথা ভুলি না— তবে তোমাদের ভাবনার সংগে সংগে অন্য সকলের কথাও আমার মনে ভিড় করে।

যাদের কথা ভেবে তুমি আমাদের বঞ্চিত কর, বলতে পারো তারা কী দিয়েছে তোমাকে? কোন মহারাজা তোমাকে তার প্রাসাদ ছেড়ে দিয়েছে কিংবা কোন লক্ষপতি তোমার আদর্শ সমর্থন ক'রে তোমাকে সামান্য সুবিধা দিয়েছে?

কথা শুনে কমলেশ আবার হাসলো, ঠিক রাজা—মহারাজার কথা তো আমি ভাবি না সুলতা। আমি যাদের কথা ভাবি, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা ছাড়া তাদের আমাকে দেবার আর কিছুই নেই। কিন্তু কে আমাকে কী দিলো সেটা আমার কাছে বড়ো কথা নয়, আমি কার জন্যে কী করতে পারলাম তাই আমার একমাত্র চিন্তা।

তোমার চিন্তা নিয়ে তুমি থাকো। আমি জানি তোমার সংগে কথা ব'লে কোনো ফল হবে না। শুধু একটি কথার স্পষ্ট উত্তর দাও, শীলাকে কী কলেজে পড়াবে?

নিশ্চয়ই।

তাহ'লে এই টাকায় আমি চালাতে পারবো না, মাসে আর কুড়ি তিরিশ টাকা বেশি চাই।

দেখি কী করতে পারি।

আর ওর কলেজে ভর্তি হবার খরচ আছে, প্রথমে কিছু বেশি টাকা লাগবে, তার ব্যবস্থাও ক'রে রেখো।

ম্লান স্বরে কমলেশ বললো, চেষ্টা করবো।

সুলতা আর কোন কথা না ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কমলেশের এই 'চেষ্টা করবো' কথা দু'টি সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তার সংগে কোনোদিনও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে না কমলেশ। জোর দিয়ে কোনো আশ্বাস দেবার সাহস নেই তার। চিরকাল ও এমনি। আজকাল মাঝে মাঝে সুলতার সব ছেড়ে দূরে কোথাও চ'লে যেতে ইচ্ছে করে।

বয়স হ'লো, এখন আর স্বামীর ছেলে মানুষী সহ্য ক'রে দিন কাটাতে ভালো লাগে না।

সুলতা জানে তাদের চেয়ে আরও অনেক বেশি দুঃখে অনেকে দিন কাটায়। হয় তো তাদের উপার্জন কমলেশের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু সুলতার দৃঢ় বিশ্বাস তারা হাজার কষ্টের মধ্যে থাকলেও আয় বাড়াতে চেষ্টার ত্রুটী করে না। সে কতো লোককে জানে যারা সদাগরী আপিসের সাধারণ কেরানী। কিন্তু তারা শুধু কলম কাগজ সামনে রেখে বধির হয়ে ঘরে ব'সে থাকে না, স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে সকাল বিকেল ছাত্র পড়িয়ে তারা ছেলে মেয়েদের সাজায়।

কিন্তু তার স্বামী যদি একটা সামান্য চাকরি করে সংসার চালাতো আর সারা মাস অভাবের মধ্যে দিয়ে সুলতাকে চালাতে হ'তো তাহ'লে সে কিছুতেই এতো উত্তেজিত হ'তো না। সে মেনে নিতো এমনি ক'রেই জীবনের শেষ দিন অবধি চালাতে হবে— এর বাইরে এক পা বাড়াবার উপায় নেই। স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকতো না তার।

কিন্তু কমলেশের কথা আজ আর সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তার স্বামী লেখা পড়া জানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্র ব'লে তার রীতিমতো নাম আছে। ইচ্ছে করলে অনায়াসে সে একটা ভালো চাকরি জোগাড় ক'রে নিতে পারতো। চাকরি যে সে পায়নি তা নয়, অনেক ভালো চাকরি পেয়ে ছিল কমলেশ। কিন্তু কোনো কাজ সে খুব বেশিদিন করতে পারে নি। দু' এক মাস পরই একদিন সুলতাকে হাসি মুখে এসে বলেছে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলাম সুলতা। একবারও ভাবে নি যে এমনি দুম ক'রে চাকরি ছাড়বার তার কোনো অধিকার নেই আর তার এই খাম খেয়ালির দাম প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে সুলতাকে দিতে হবে।

তবু তখন সুলতার এতো কথা মনে হয়নি। স্বামীর ছেলেমানুষী

মানিয়ে নিয়ে সেও হেসে বলেছে, তুমি দেখছি ইস্কুল পালানো দুষ্টু ছেলে-দেরও ছাড়িয়ে গেলে—এখন চলবে কেমন ক'রে বল ?

তুমি পাশে থাকতে আমার ভাবনা কী সুলতা ? আর জানো না কলম তরবারির চেয়েও শক্তিশালী ? ও সব চাকরি বাকরি আমার পোষাবে না বাপু। অফিসে ঢুকলেই মনে হয় আমি যেন ইচ্ছে ক'রে সময় নষ্ট করছি, তার চেয়ে বাড়ি ব'সে লিখলে অনেক কাজ হয় !

তাই লেখনা কেন, কে তোমাকে বারণ করেছে লিখতে ?

সুলতার কথা শুনে কমলেশ জোরে হেসে উঠে বলেছে, এমন স্ত্রীভাগ্য ক'জন লেখকের হয় ?

তারপর বোধহয় সুলতার কথার ওপর নির্ভর ক'রে পর পর অনেক চাকরি ছেড়েছে কমলেশ। যেন সব দায় সুলতার। তার বিশ্বাস, সে ঠিক যেমন ক'রে হোক সংসার চালিয়ে নেবেই। আর সত্যি তাই করেছিলো সুলতা। স্বামীকে লেখবার প্রচুর সুযোগ দিয়ে সে সমস্ত সুখ সাধ আহ্লাদ তুচ্ছ ক'রেছে। এমন কি, পাছে অভাবের কথা শুনলে কমলেশের লেখার ব্যাঘাত হয় তাই তাকে কিছু না জানিয়ে চুপে চুপে একা বেরিয়ে গিয়ে একে একে নিজের সমস্ত গয়না বিক্রী ক'রে এসেছে।

আজ সুলতার মনে হয় সে সব না করলেই যেন ছিলো ভালো। তাহ'লে কমলেশ এমনি নির্বিকারভাবে দিন কাটাতে পারতো না। একেবারে প্রথম থেকে তার অভ্যাস খারাপ ক'রে দিয়ে আজ অকস্মাৎ তাকে সংসার চালাবার ব্যাপারে সচেতন করবার চেষ্টা করলে কোনো ফল যে হবে না সেকথা সুলতার বোঝা উচিত।

কিন্তু আশ্চর্য, কমলেশ চিরকাল সেই ছেলেমানুষ হ'য়েই রইলো। একবার—সুলতার আজও সেকথা স্পষ্ট মনে আছে—সংসারে তখন দারুন অভাব, শীলা মোটে কয়েক মাসের। সুলতার শরীর খুব খারাপ। তার

ওপর ডাক্তারের খরচ বেড়েছে। চাকরি ছেড়ে বসেছিলো কমলেশ। একবারও বোধহয় ভাবেনি যে সুলতা যে কোনো মুহূর্তে শেষ হ'য়ে যেতে পারে। শীলার জন্যেও খুব একটা ব্যাকুলতা কমলেশের কোনোদিনই ছিলো না। যা হোক, সেই সময় অভিমানে বুক ভ'রে উঠেছিলো সুলতার। ওর মনে হয়েছিলো কমলেশের কি হৃদয় ব'লে কিছু নেই। কারোর দিকে না তাকিয়ে কেমন ক'রে সে এমন হাত পা গুটিয়ে চুপ ক'রে ঘরে বসে থাকতে পারে। কিন্তু পরমুহূর্তেই লজ্জায় সুলতা এতোটুকু হয়ে গিয়েছিলো। ছি ছি, এসব কি আবোল তাবোল ভাবছে ও। ওর স্বামী কি সাধারণ মানুষ না কি! কতো বড়ো কাজে সে সারাদিন ব্যস্ত থাকে, তার সময় কোথায় এসব তুচ্ছ ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার! সুলতার নীচ মন, তাই সে অমন দেবতার মতো স্বামীকেও ছোটো ক'রে দেখে। তারই তো উচিত সব সময় লক্ষ্য রাখা যেন কমলেশের কোনো অসুবিধা না হয়--সে যেন নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজ ক'রে যেতে পারে। তা না হ'লে লোকে শুনলে বলবে কী, তারা তো সুলতাকেই দোষ দেবে। তার বহু ভাগ্য যে কমলেশের মতো অমন পণ্ডিত স্বামী পেয়েছে।

তাই একদিন কমলেশকে কাছে ডেকে সে বললো, দ্বিজেন বাবু বলছিলেন ওঁর অফিসে একটা চাকরি খালি আছে।

আমাকে সেটা নিতে বলছো সুলতা ?

লজ্জা পেয়ে সুলতা বললো, না না, মানে, আমার শরীর তো ভালো যাচ্ছে না আর মেয়েটার জন্যেও দুধের খরচ লাগবে, তাই অন্তত কয়েক মাসের জন্যে যদি—

কমলেশ বললো, দ্বিজেন বাবুর সংগে তোমার কথা হয়েছে আমি জানি। কিন্তু আমাকে দিয়ে কি ওঁর কাজের সুবিধা হবে ? কতো ভালো লোক পেতে পারেন উনি ?

ঠোঁট উল্টে সুলতা বললো, ভালো লোক পাওয়া কি অতোই সোজা? ওই মাইনেতে তোমার মতো নামকরা পণ্ডিত লোক উনি কোথায় পাবেন শুনি?

কমলেশ হেসে সুলতার মাথায় হাত দিয়ে বললো, আপিসের কাজে তো পণ্ডিত লোকের দরকার হয় না সুলতা।

তা'হলে কেমন লোকের দরকার হয়?

নিষ্ঠাবান লোকের। এমন কোনো লোক যে আপিসের কাজে মনপ্রাণ সঁপে দেবে—

তুমি কি তা করবে না নাকি?

আবার হাসলো কমলেশ, তা করতে পারলে তো কোনো ভাবনাই ছিলো না। আমি তা করতে পারি না বলেই তো আজ আমার চাকরির জন্যে তোমাকে ভাবতে হচ্ছে—

না না, সে কী কথা ছিঃ, তোমার চাকরির ভাবনা আমি ভাববো কেন? তুমি সব দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক বড়ো। এ সব কথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না লক্ষীটি!

কমলেশ সুলতার পাশে খাটের ওপর ব'সে প'ড়ে বললো, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। তুমি ঠিক কথাই বলেছো। কিন্তু আমার কথা কী জানো, একটু চুপ করে থেকে সে বললো, আমার কথা হ'লো কাউকে ঠকাবো না, কাউকে ফাঁকি দেবো না। তা করবার জন্যে অনেক লোক আমাদের সমাজে আছে। আমি আমার লেখার মধ্যে দিয়ে তাদের সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক ক'রে দেবার চেষ্টা করবো। তাই আমিও তাদের একজন হ'য়ে লোককে ঠকিয়ে এক পয়সাও নিতে চাই না।

কিছু না বুঝে সুলতা বললো, না না, তুমি কেন লোককে ঠকাতে যাবে। কতো বড়ো মন তোমার!

তাই আমি চাকরি করতে পারি না। আমার কেবলই মনে হয় আমি মন দিয়ে কাজ করতে পারছি না অথচ লোককে ঠকিয়ে মাসের পর মাস পয়সা নিয়ে যাচ্ছি। আরও একটা কথা, হয়তো যে আমার চেয়ে অনেক ভালো কাজ করতে পারতো আমি যেন তাকে বঞ্চিত ক'রে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক একা ভোগ করছি।

সুলতা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা না ব'লে তখন শুধু মনে মনে বলেছিলো, তুমি কী মহৎ!

কমলেশ আবার বললো, আমি একটি মাত্র কাজে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছি, তা'ছাড়া অন্য কোনো কাজ আমি নিষ্ঠার সংগে করতে পারি না। আমি জানি না আমার ক্ষমতা কতোখানি, আর এ কাজের জন্যে কী পারিশ্রমিক আমি পাবো, তবু এ ছাড়া অন্য কিছু বোধ হয় আমি জীবনেও করতে পারবো না। শুধু এই ভেবে দুঃখ হয় যে তোমাকে আমার জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে—

বাধা দিয়ে সুলতা ব'লে উঠলো, আঃ কী যা' তা বল!

বিয়ের পর থেকে কমলেশের কাছ থেকে এমন কথা শুনতে শুনতে সুলতা বিভোর হ'য়ে যেতো। তখন তার অল্প বয়স, এসব গভীর কথা শুনতে ভালো লাগতো খুব। আর পাঁচজন বন্ধু বান্ধবকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করতো, আমার স্বামী একজন অসাধারণ মানুষ।

কিন্তু সেদিন কী জানি কেন, সুলতার মনের কোথায় যেন একটা বিরাট আঘাত বেজেছিলো। সেই চাকরি শেষ অবধি নিলো না কমলেশ। মুখে যাই বলুক না কেন, সুলতা মনে মনে ভেবেছিলো, সব দিক বিবেচনা ক'রে অন্তত কিছুদিনের জন্যে কমলেশ চাকরিটা নিয়ে নেবে। সব সময় তো আর ইচ্ছে মতো কাজ করা যায় না, প্রয়োজন হলে অনেক সময় প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়।

একা হলে সেদিন হয়তো সুলতার মাথায় এতো কথা আসতো না। কিন্তু পাশের ছোটো মানুষটির দিকে যতোবার সে তাকাতে লাগলো ততোবার তার কমলেশকে একটু স্বার্থপর মনে হ'লো যেন। এর জন্যে সে কি কয়েক মাসের জন্যে সব কিছু ভুলে যেতে পারতো না ?

তারপর দেখতে দেখতে শীলা বড়ো হ'তে লাগলো কিন্তু কমলেশের কোনো পরিবর্তন হ'লো না। কারোর দিকে না তাকিয়ে সে আপন মনে শুধু নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগলো।

সেদিনের পর সুলতা আর কোনো দিনও নিজের সুখ দুঃখের কথা কমলেশকে বলেনি। যদি সে একা হতো তাহ'লে সংসারের অভাবের কথা তাকে জানাতো না। চাপা অভিমানের দাহে যেমন ক'রে হোক সে চালিয়ে দিতো দিনের পর দিন।

কিন্তু শীলার মুখের দিকে তাকালেই তার সমস্ত গোলমাল হ'য়ে যায়। আর মনে হয়, কমলেশ যদি এমনি ক'রেই শুধু পরের ভাবনা নিয়ে সারা-দিন রাত কাটাবে তাহ'লে ওকে পৃথিবীতে আনবার কী দরকার ছিলো !

কমলেশের মতো আরও তো কতো লেখক আছে বাংলা দেশে। প্রায় তাদের সকলকেই সুলতা চেনে। তারা কেউ তো তার স্বামীর মতো নয়। তারা সকলেই কোনো না কোনো চাকরি করে, সাধারণ লোকের মতো নিজেদের সংসারের অভাব-অভিযোগের কথা ভাবে। কমলেশের চেয়ে তাদের নাম কোনো অংশে কম নয়।

সুলতা তাদের উল্লেখ করলেই কমলেশ হেসে বলে, সকলে তো সমান নয় সুলতা। আমার বন্ধু বান্ধবরা অনেক কাজের মধ্যে সাহিত্য করাকেও একটি কাজ ব'লে মনে করে। কিন্তু আমার জীবনে মাত্র একটি কাজ, তা' হ'লো—

বাধা দিয়ে স্বামীকে থামিয়ে সুলতা বলে, জানি আমি।

যাহোক এই হ'লো সুলতার সংসার। মাসের প্রথমে সংসার চালাবার জন্যে একসংগে থোক টাকা তার হাতে পড়ে না, কতো টাকা সারা মাসে সে পাবে তা' জানে না, গত মাসে যা' পেয়েছিলো, এ মাসে তার চেয়ে কম পাবে না বেশি পাবে তা'ও জানা নেই—শুধু অনিশ্চিতের ওপর ভর ক'রে তাকে মুখ বুজে চলতে হয়। এ মাসে বাড়ি ভাড়া দেবে না, ও মাসে গয়লাকে কম দেবে, তারপর শীলার ইস্কুলের মাইনে বাকি রাখবে—এমনি ক'রেই টিপে টিপে তাকে কাটাতে হবে সারা জীবন।

ওদিকে শীলাও আর ছোটো মেয়েটি নেই। দু'দিন পরে সে কলেজে পড়বে। কমলেশ তাকে আশা দিয়েছে যে তার কলেজে ভর্তি হওয়ার টাকা যোগাড় হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামীর আশ্বাসে আর বিশ্বাস নেই সুলতার। সে জানে যথা সময়ে কী কথা বলবে কমলেশ। হয়তো তার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক তেমনি ক'রেই কমলেশ বলবে, যে টাকা পাবো ভেবেছিলাম তা' এমাসে পাওয়া গেল না—এই আসছে মাসে বোধ হয় পাওয়া যাবে—

তখন কী করবে সুলতা? চিরদিন এমনি হ'য়ে এসেছে। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও কমলেশের এই আশ্বাসের জন্যে সে সংসারের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে নি। সে জানে আজও পারবে না। তাই সেই এক কথা বার বার সে এমন ক'রে ভাবছে।

মেয়ে এখন বড়ো হয়েছে। কলেজের মাইনে বাকি রাখলে পিতৃভক্তি যে তার প্রবল হ'য়ে উঠবে না সে কথা সুলতা জানে। তাই মেয়ের বেলায় সে একেবারে প্রথম থেকেই সতর্ক হ'য়ে কাজ করতে চায়।

মেয়ের কথা মনে হলেই সুলতার চারপাশে যেন অন্ধকার নামে। কী তার ভবিষ্যৎ? লেখা পড়া যদি না করে তাহ'লে সে কী করবে? মেয়ের বিয়ের ভাবনা সব বাপ মা ভাবে। কিন্তু সেকথা ভাবতে ভয় করে

সুলতার। কী তাদের সম্বল? কী দিয়ে একমাত্র মেয়েকে পার করবে তারা? কোথাও সামান্য সঞ্চয় নেই, ভবিষ্যতে সঞ্চয়ের সামান্য সম্ভাবনাও নেই।

তাই থেকে থেকে আজকাল সুলতার মাথার শিরাগুলি দপ দপ করে, শরীর ভেঙে পড়ে দারুণ ক্লান্তিতে, চোখের সামনে থেকে সমস্ত আলো যেন মুহূর্তে লুপ্ত হ'য়ে যায়।

দুই

শুধু সুলতা নয়, তার মতো কথা কমলেশকে আরও অনেকে বলে। প্রায়ই তার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন তাকে নানা উপদেশ দেয়, একটা চাকরি করলে পারতে কমলেশ, বয়স হ'লো এখন আর ওসব ছেলেমানুষী মানায়না।

কিংবা কেউ কেউ আবার বলে, দু একটা বই এবার ছবিতে লাগাতে চেষ্টা কর। ফিল্ম তো অনেকের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে শুনি।

প্রথম প্রথম এমন কথা শুনলে কমলেশ মনে মনে হেসে উত্তর দিতো, চাকরি করতে পারলে তো খুশি হতাম। কিন্তু পারলাম কই? আর ভাগ্য? লেখকের ভাগ্য তার সাহিত্য যদি ফেরাতে না পারে তাহ'লে আর কিছুতেই তার ভাগ্য ফেরে না। চেষ্টা করে যেমন সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়না তেমন একজন সাহিত্যিকও চেষ্টা করলে টাকা করতে পারেনা। ফিল্মের লোকেদের কাছে আমি বই হাতে ঘুরতে পারি বটে কিন্তু তারা নিজেরা যতোক্ষণ না আমার কাছে আসছে ততোক্ষণ আমার সাহিত্যের কোনো মূল্যই তারা দেবেনা, বরং কৃপা করবে। কারোর কৃপা যদি সহ্য করতে পারতাম তাহলে তো চাকরিই করা যেতো।

যারা কমলেশকে এই সব কথা বলে তারা নিঃসন্দেহে তার হিতাকাঙ্খী, তাদের কথা ভেবে বিব্রত বোধ করেনা সে। কেননা ছেলেবেলা থেকে বাড়ির প্রত্যেকে তাকে ঠিক এই ধরনের কথা বুঝিয়ে এসেছে।

কিন্তু সুলতার কাছ থেকে সে বোধ হয় একটু বেশি কিছু পাবার আশা করেছিলো। সে ভেবেছিলো আর কেউ তাকে না বুঝুক সুলতা বুঝবে।

যদি পৃথিবী সুদ্ধ লোক তার কাজের জন্যে তাকে অবহেলা করে, সুলতা কোনোদিনও করবে না। এবং হাজার অভাব সংসার ঘিরে ফেললেও সুলতা কোনোদিনও কোন অভিযোগ করবেনা।

অবশ্য কমলেশ খুব ভালো করেই জানে, এই পৃথিবীতে কেউ কারোর জন্যে মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করেনা। একদিন না একদিন অভিযোগ করেই। তবু সব জেনে শুনেও সে না ভেবে পারেনি যে সুলতা চিরকাল তাকে অন্য চোখে দেখবে—সে কখনও বলবেনা, কমলেশ তাকে সব সুখ সাধ আহ্লাদ থেকে ইচ্ছে করে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে।

যারা দূরের মানুষ তারা বলুক যা খুশি—তাতে কমলেশের কিছুই যায় আসে না। কিন্তু সুলতা যে তার বড়ো কাছের মানুষ। পৃথিবীর একটি মানুষও তাকে না বুঝলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সুলতা তো সর্বক্ষণ তার কাছে কাছে আছে। সে তো নিজের চোখে দেখছে কমলেশের জীবনে কাজ ছাড়া কিছুই নেই। তবু সে কেমন ক'রে ভাবে সে তাকে ইচ্ছে করে সব সুখ সাধ থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে।

একথা ভাবলে কমলেশের সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে যায়। নিজের ওপর সে যেন ক্ষণকালের জন্যে আস্থা হারায়। তবে কি সে এতোদিন বৃথা পরিশ্রম করে এলো? তবে কি সত্যি এতোদিন সকলকে ঠকিয়ে এলো? তবে কী সত্যি কারোর কাছে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই? তাহ'লে সে কী করবে এখন?

একথা ভাববার সংগে সংগেই কমলেশের নিজের কাছে নিজেকে বড়ো বেশি ছোটো মনে হয়। সেও তো স্বার্থপরের মতো ভাবনা ভাবতে আরম্ভ করেছে। কেন সে বেশি আশা করবে সুলতার কাছে? আজ অবধি সে কী দিয়েছে তাকে? এই দুর্বলতা কমলেশকে জয় করতে হবেই। সে জানে নিজেকে একেবারে অস্বীকার করতে না পারলে সে তার কাজে

মন প্রাণ সঁপে দিতে পারবেনা। সে সম্পূর্ণ একা। তার কাছে কেউ নেই— সুলতাও নয়। যারা তার কাছের মানুষ, যারা তার আত্মীয়, তারাও যদি কোনো দিন কমলেশকে না চেনে ক্ষতি নেই। কারোর কাছে আর কোন কিছুই সে আশা করবেনা। দেনা পাওনার হিসেব করা তার কাজ নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সে যথাসাধ্য নিজেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু তবু বন্ধু আত্মীয়রা সৎ পরামর্শ দিলেও থেকে থেকে তার মনে হয় তার ওপর যেন অবিচার করা হচ্ছে। আজ যদি সে লেখক না হ'য়ে ডাক্তার কিংবা ব্যারিস্টার হ'তো, আর তার আয়ের সংখ্যা আজকের মতোই হ'তো তাহ'লে কেউ তো তাকে বলতো না, ডাক্তারি না ক'রে অন্য কিছু কর, কিংবা ব্যারিস্টারি ছেড়ে একটা চাকরি দেখে নাও—

বরং কমলেশ নিশ্চিত জানে তখন তারা তাকে সান্তনা দিয়ে বলতো ধৈর্য ধরো, এসব কাজে নাম করতে একটু দেরি লাগে। কিন্তু একবার পয়সা হ'তে আরম্ভ করলে রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না। হয় তো তারা দু' এক জনের নাম উল্লেখ ক'রে আরও বলতো, ওই তো অমুক বাবু, দু'টাকার রুগীর আশায় সেদিন অবধি গালে হাত দিয়ে ডিস্পেনসারীতে ব'সে থাকতো, অতো ভালো ক'রে ডাক্তারি পাশ ক'রে সংসারে চালাতে পারতো না বেচারি·········কিন্তু এখন ? দু' বছরের মধ্যে দু'টো মোটর গাড়ি কিনে ফেলেছে ভদ্রলোক·········এমনি আরও অনেক কথা।

একথা অবশ্য ঠিক, একজন ভালো ডাক্তারের যা আয়, একজন ভালো লেখকের তা' নয়। তবু দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যতো বাড়ছে লেখকের আয়ও ততোই বাড়ছে। কিন্তু দুই কাজের জাত আলাদা। একটার সংগে আর একটার তুলনা করলে চলবে কেন। কমলেশ ভাবে, সে শুধু লিখে যা পায় তা' দিয়ে সুলতা চালাতে পারে না কেন। যদি বোঝে আয়ের তুলনায় খরচ বেশি হচ্ছে তা হ'লে এ বাড়ি ছেড়ে আরও ছোটো

বাড়ি ভাড়া নিয়ে খরচ কমাবার চেষ্টা করলেই তো হয়।

একদিন কমলেশের মুখ থেকে একথা শুনে সুলতা বলেছিলো, এর চেয়ে খারাপ ভাবে থাকবার কথা তুমি ভাবো কেমন ক'রে? আরও কমে চালাতে গেলে বস্তিতে গিয়ে থাকতে হয়—

অনেক সময় কমলেশ নিজেকে ঠিক বুঝতে পারে না। তার মনে হয়, সে একজন সাধারণ-বুদ্ধি মানুষের মতো হ'লে হয় তো সব দিক দিয়ে ভালো হ'তো। তাহ'লে তার মনে আজকের মতো এতো যন্ত্রণা থাকতো না। সে নানা কাজ করে প্রাণপণে টাকা করবার চেষ্টা করতো। গাড়ি বাড়ি আর পার্থিব সম্পদের ভারে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে একদিন পরম শান্তিতে শেষ হ'য়ে যেতে পারতো।

কিন্তু আশ্চর্য তার মন। আশেপাশের মানুষের দিকে তাকিয়ে কমলেশের মনে অকারণ বেদনা বোধ প্রবল হ'য়ে ওঠে। সে ভাবে, আজকের মানুষ যেন এক বিরাট শূন্যতার মাঝে বাস করছে। সম্পদের মাপ কাঠিতে আজ মনুষ্যত্বের বিচার হয়। সে-সম্পদ কেমন ক'রে হ'লো তার খোঁজ রাখে না কেউ। এই কী পরিপূর্ণতার প্রকাশ? কিন্তু এসব কথা কা'কে বলবে কমলেশ? ব্যাপক জীবনের স্বপ্নে যে বিভোর সে কখন নিজের কথা ভেবে শূন্যতার মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবে! ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে নিজের সংগে সর্বক্ষণ সংগ্রাম ক'রে সে কেমন ক'রে তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে দেবে।

তাই সে নিজের মধ্যে দিয়ে শুধু পরিপূর্ণতার স্বপ্ন দেখে। অর্থের

মাধ্যমে আত্ম ঘোষণার কথা তার কখনও মনে জাগে না। ব্যাপক শূন্যতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। সে কী পেলো আর কী হারালো, তার কী রইলো আর কী রইলো না, সে প্রাসাদে বাস করলো কি পর্ণ কুটীরে দিন কাটালো—এসব কথা কখনও তার মাথায় আসে না। সে শুধু ভাবে আজকের এই আকাশ জোড়া শূন্যতা থেকে প্রত্যেক মানুষের মুক্তির কথা। যার যা পাওনা তা' যেন সে পুরোপুরি পায়, অকারণ লোভে কেউ যেন কাউকে বঞ্চিত না ক'রে। ন্যায্য পাওনা পেলে এতো ক্ষোভ থাকবে না, বঞ্চিত না করতে পারলে এতো দম্ভ থাকবে না। তখন সুস্থ মন নিয়ে মানুষ চারপাশে তাকাতে শিখবে। আজকের মতো এতো অবহেলা জমা হ'য়ে থাকবে না কোথাও।

এ বাড়িতে বিকাশ নিয়মিত আসে। আর যখনই আসে তখনই কমলেশের খবর নিয়ে যায়। সেদিন সুলতা বেরিয়ে যাবার পর কমলেশ কিছুতেই কাজে মন দিতে পারছিলো না, তার কথাগুলি মনে ক'রে মাথার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিলো। আর ঠিক সেই সময় বিকাশ ঘরে ঢুকলো। সে এতো নিঃশব্দে এসেছিলো যে প্রথমে কমলেশ তাকে দেখতে পেলো না, তাই তার গলার স্বর শুনে চমকে উঠলো।

থেমে থেমে বিকাশ বললো, আমার একটা বই বেরিয়েছে, প্রথমেই আপনাকে দিতে এলাম, এই যে—

এসো বিকাশ, কমলেশ হেসে বললো, বাঃ, বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে তো তোমার বই।

নানা কাগজে প্রকাশিত আমার কবিতাগুলি নিয়ে এই বই। সময় হ'লে দয়া ক'রে আপনাকে একটা সমালোচনা লিখে দিতে হবে।

নিশ্চয়ই দেবো, বইটা নেড়ে চেড়ে কমলেশ বললো, আমি বোধ হয় এর সবগুলি পড়েছি।

আমি নিজেও অনেক শুনিয়ে গেছি আপনাকে।

কমলেশ বিকাশের কবিতার বই টেবিলের ওপর রেখে চুপ ক'রে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তাকে দেখলে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। সেও এমনি সাহিত্যিকদের সংগে আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত হ'তো, বয়সের অনেক তফাৎ থাকলেও তাদের বাড়ি গিয়ে সময়ে—অসময়ে চুপচাপ বসে থাকতো। আর মনে মনে ভাবতো সেও একদিন এদের মতো নাম করবে। এরা সকলেই অন্য কিছু করে, কেউ অধ্যাপক, কেউ উকিল, কেউ সরকারের বড়ো চাকুরে—সে নিজে যখন বড়ো হবে তখন অন্য কিছুই করবে না, শুধু লিখবে। এসব ভাবতে ভাবতে তার চোখে ভবিষ্যতের উজ্জল ছবি ফুটে উঠতো। কমলেশ তখন থেকেই ভাবতো, লেখা ছাড়া যখন সে আর কিছু করবে না, লেখার জন্যে যখন সে সব ছাড়তে রাজি তখন নিশ্চয়ই সে একদিন তার সাধনার দাম পাবে। আর পাঁচজন লেখকের সংগে লোকে তার নাম করবে না। মানুষের জন্যে তার বেদনা বোধ হবে অন্য সব লেখকের চেয়ে অনেক বেশি গভীর। ছেলেবেলা থেকেই এমনি ভাবনা ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা তার ছিলো না। আজও সে সামান্য অনুতাপ করে না। কিন্তু থেকে থেকে বুকের মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভব করে।

বিকাশ, কমলেশ হেসে বললো, কবিতার বই বের ক'রে যে কাজ তুমি শুরু করলে তার শেষ কোথায় জানো?

কমলেশের কথার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে বিকাশ বললো, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কমলেশ বললো, যদি শেষ অবধি সাহিত্য ছাড়তে না পারো তাহলে অন্য সব কিছু তোমাকে ছাড়তে হবে—

বাধা দিয়ে বিকাশ বললো, আপনার কথার উত্তরে যেকথা মনে হচ্ছে তা আমি আপনাকে দেখেই শিখেছি—

কী কথা বিকাশ ?

সাহিত্য কেউ ইচ্ছে করলেই ধরতে পারে না কিংবা খুশি হলেই ছাড়তে পারে না। অনেকেই তো সাহিত্যিক হবার কতো চেষ্টা করেছে। কিনা শেষ অবধি বাধ্য হয়ে তাদের সে কাজ ছাড়তে হয়েছে। আবার সাহিত্যের জন্যে অনেক দুঃখ যন্ত্রণা পেলেও অনেকে হাজার চেষ্টা করেও এটা ছাড়তে পারে নি।

ঠিক কথা, উজ্জ্বল চোখে বিকাশের দিকে তাকিয়ে কমলেশ বললো, ধরবার ছাড়বার কথা ওঠে না বিকাশ, এ এমনি একটা প্রেরণা যা লোক বিশেষের রক্তের মধ্যে মিশে থাকে। আর এমনি মাতিয়ে রাখে যে জীবনের সংগে দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ করবারও অবসর হয় না।

বিকাশ বললো, তাই একজন সার্থক সাহিত্যিক যা পায় ততো পাওয়া আর কারোর ভাগ্যে ঘটে না।

অভিমানের সুরে কমলেশ বললো, এবার একটু ভুল বললে বিকাশ। যা পাওয়া উচিত সব সময় একজন লেখক আজকের সমাজে তা' পায় না, একটু চুপ ক'রে থেকে কমলেশ আবার বললো, তা যদি পেতো তাহ'লে তার সৃষ্টি হয়তো আরও সার্থক, আরও সুন্দর হ'তো—

সে—দোষ সমাজের, লেখকের নয়, কমলেশের মুখের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিকাশ বললো, লেখকরা সমাজকে নতুন রূপ দেয়,

সভ্যতাকে ব্যাপক ক'রে তোলে। আর একথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সাহিত্যিককে অস্বীকার ক'রে মানুষের একেবারেই চলে না, বিকাশ বলে চললো, লেখকের লেখা সাজিয়ে দেশে দেশে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিত্থালয়, যে গান শুনে মুগ্ধ হই সে—গান রচনা করেছে কবি, যে চলচ্চিত্র আজ লক্ষ মানুষকে আনন্দ দেয় তার কাহিনী লিখেছে লেখক, পৃথিবীর সংস্কৃতির বিনিময় করেছে সাহিত্যিক—

কমলেশ হেসে বললো, দেশে শিক্ষার মান যতো বাড়বে তোমার মতো কথা লোকেরা ততো বলবে সে—বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু দুঃখ এই যে লেখক তার যোগ্য মূল্য কোনোদিনই পায় না।

কারণ আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, সহজ স্বরে বিকাশ বলে গেল, আজ যে গাড়ি চড়ে বেড়ায়, যার স্ত্রী গয়নার ভারে কুঁজো হ'য়ে যায়, কে তাদের মনে রাখে বলুন? কিন্তু একজন সাহিত্যিক আজ দাতব্য চিকিৎসালয়ে না খেতে পেয়ে মরলেও অনেক বছর পরে ভুল বুঝতে পেরে লোকে তার মর্মর মূর্তি গড়ে চোখের জল ফেলে—এ প্রীতি কি সহজে পাওয়া যায়?

কমলেশ বিকাশের কথার উত্তরে আর কোন কথা বললোনা। অনেক সময় তার ঠিক এই কথাগুলি সুলতাকে বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কি জানি কেন সুলতাকে তার এমন কথা বলতে বেধে যায়। বলে বুঝিয়ে যুক্তি দিয়ে কারোর কাছে থেকে কিছু পেতে চায়না—সুলতার কাছ থেকে তো নয়ই।

যাহোক হয়তো এতো কথা ভাবে বলেই বিকাশকে কমলেশের ভাল লাগে। লেখা পড়ার বিকাশ রীতিমতো ভালো। কমলেশ তার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের কথা ভাবে।

কিন্তু দিনে দিনে অকারণে বিকাশের ওপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগলো

সুলতা। হয়তো এটা তার সাহিত্য প্রীতির জন্যেই। বিকাশের ওপর সুলতার এই বিরূপ ভাব শীলারও দৃষ্টি এড়ালো না।

আগে প্রায়ই আগ্রহের সংগে বিকাশকে খেয়ে যেতে বলতো সুলতা। কিন্তু আজকাল আর তার সংগে তেমন করে কথা বলেনা। ভালো রান্না হলে কমলেশ যখন বলে, বিকাশ খেয়ে যাক না আজ এখানে?

খাবে খাক, এমন ক'রে কথা বলে সুলতা যে কমলেশের মনে হয় সে যেন তাকে চেনেই না।

এসব নিয়ে বিকাশ আর শীলা একেবারেই মাথা ঘামায় না। তারা জানে যথাসময়ে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। ওরা দু'জনে অবশ্য এর মধ্যেই সব ঠিক করে রেখেছে। আর দু'বছর অপেক্ষা করতে হবে ওদের। একটা বড়ো চাকরি করবে বিকাশ। এর ফাঁকে একবার বিলেত থেকে ঘুরে আসবে।

বিকাশের মা নেই। রাসমোহন বাবুর একমাত্র ছেলে বিকাশ। ছেলের ওপর বাপের অনেক স্বপ্ন—অনেক আশা। কবে তিনি এ পৃথিবী ছেড়ে যান ঠিক নেই। তাই তার ইচ্ছে বিকাশ তাড়াতাড়ি বিলেত থেকে ইক-নামক্সের ডিগ্রিটা নিয়ে আসে। আর বিলেতে পাঠাবার আগে তিনি তার বিয়েটা সেরে ফেলতে চান।

এই সব কথা শুনেছিলো ব'লে আজ খুব সকালে বিকাশ শীলার সংগে আলোচনা করতে এসেছিলো। তাই কমলেশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সে সটান শীলার সামনে এসে দাঁড়ালো। সুলতা তখন রান্নাঘরে।

শীলা পাশ করবার খবর দিয়ে মাথা নিচু করে এক মনে কা'কে চিঠি লিখছিলো, এমন সময় বিকাশ ঘরে ঢুকে আস্তে ডাকলো, এই!

পাশের ঘরে যখন সে কমলেশের সংগে কথা বলছিলো তখন তার গলা শুনেছিলো শীলা। তাই সে অবাক হ'লো না। মাথা না তুলে মৃদু হেসে বললো, একটু ব'সো, চিঠিটা শেষ ক'রেনি—

উঃ, আমি যেন ওঁর—

বিরক্ত ক'রো না, ব'সো চুপ ক'রে—

বিকাশ শীলার সামনে থেকে কাগজপত্র টান মেরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে বললো, আমি যখন থাকবো না তখন চিঠি লেখবার অনেক সময় পাবে, এখন আমাকে দেখিয়ে প্রেমপত্র লেখবার ভান করতে হবে না—

এই আস্তে, বিচলিত হ'য়ে শীলা বললো, কী যা' তা বলছো, মা বাবা শুনতে পেলে কী ভাববে?

ওঁরা তো আর তোমার মতো বোকা নন, যা ভাববার ঠিক সময় থেকে ভাবতে আরম্ভ করেছেন, শীলার সামনে নিজের কবিতার বই বাড়িয়ে দিয়ে বিকাশ বললো, এই যে শীলা, আমার প্রথম কবিতার বই—

বাঃ, বেরিয়ে গেছে বুঝি?

হ্যাঁ, নাম দিয়েছি "সম্রাজ্ঞী", হেসে বিকাশ বললো, কে আমার সম্রাজ্ঞী, আশা করি তা' তোমার অজানা নেই—

আমি কেমন ক'রে জানবো, বই ড্রয়ারের মধ্যে রেখে শীলা বললো, কতো লোকের সংগে তোমার আলাপ আমি তার কী খবর রাখি—

আচ্ছা পরে দেখা যাবে, কে কার খবর রাখে। কিন্তু শীলা বইটা দেরাজের মধ্যে রেখে দিলে কেন, একটু উল্টে পাল্টে দেখ, কবি তোমার সামনে ব'সে—

শীলা বললো, ঠিক সময় দেখবো। এখন মা এঘরে আসতে পারে তাই লুকিয়ে রাখলাম—

বাঃ, রাগের ভান ক'রে বিকাশ বললো, আচ্ছা হিংসুটে মন তো তোমার, আমার একটু নাম হয় তুমি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারো না দেখছি—

শীলা হেসে জিজ্ঞেস করলো, কী ক'রে বুঝলে?

আমার প্রথম কবিতার বই—ভেবেছিলাম তুমি খুশি হয়ে বারবার দেখবে, পাঁচ জনকে দেখাবে তা' না নিজেও ভালো করে দেখলে না, পাছে অন্য কেউ দেখে ব'লে একেবারে লুকিয়ে রাখলে—

বাধা দিয়ে শীলা বললো, পাঁচজনকে এই কবিতার বই দেখিয়ে বেড়ালে তোমার খুব নাম হবে কি না জানি না, আচ্ছা নামের কাঙাল তো তুমি, শীলা হেসে চাপা স্বরে বললো, তোমার ভালোর জন্যেই এ বইটা লুকিয়ে রাখলাম—

অবাক হয়ে বিকাশ জিজ্ঞেস করলো, কেন?

তুমি তো সবই জানো, বিকাশের দিকে তাকিয়ে শীলা বললো, কিছু দিন থেকে মা'র যে কি হয়েছে, লেখার কথা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তোমার বই বেরিয়েছে শুনলে মা খুব খুশি হবে না, বরং তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারে।

শীলার কথা শুনে বিকাশ চুপ করে রইলো। হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারলো না। তার কাছে কিছুই অজানা নেই। এ বাড়ির সব খবরই সে ভালো ক'রে জানে।

তুমি তো সবই জানো, আস্তে শীলা বললো, আজকাল মা আর বাবাকে সহ্য করতে পারে না, আর বাবার ওপর রেগে থাকে বলে লেখার কোনো রকম কথা উঠলেই যা তা বলে বসে। আমার কলেজে পড়া নিয়ে মা বাবাকে যা তা বলে এসেছে—

মাসিমা তোমাকে কলেজে পড়াতে চান না নাকি?

চায়। তাই বাবার সংগে খরচপত্রের কথা নিয়ে কি সব কথা হচ্ছিলো।

বিকাশ বেশ জোরে বললো, কলেজে তোমাকে পড়তেই হবে।

কেন বল তো? আমার আর একটুও পড়াশুনো করবার ইচ্ছে নেই, ওসব আমার হবে না—

কে বললো হবে না? আমি বলছি হবে। তোমার মতো বুদ্ধি ক'জন মেয়ের থাকে শীলা?

জানি না। কিন্তু সত্যি বলছি আমি কলেজে পড়তে চাই না, একটু থেমে শীলা বললো, আমি চাই না আমার ভাবনা ভেবে বাবার এতোটুকু অশান্তি হয়।

বিকাশ বললো, সত্যি তাঁর মতো লোক হয় না। আমাদের দেশে জন্মেছেন ব'লে ওঁর মতো লোককেও টাকার ভাবনা ভেবে কষ্ট পেতে হয়—আশ্চর্য!

তাই বলছিলাম আমি কলেজে পড়লে বাবার অশান্তি আরও বেড়ে যাবে।

কিন্তু কলেজে না পড়লে কী করবে তুমি?

আমি জানি না। আজকাল তো মেয়েদের জন্যে নানা রকম চাকরি হয়েছে। আর মেয়েরাও রীতিমতো চাকরি করছে। তাই ভাবছিলাম আমিও একটা—

চাকরি করবে, না? তা' হয় না শীলা। এসব আজে বাজে ভাবনা ভেবে সময় নষ্ট ক'রো না।

তাহ'লে কী করবো ব'লে দাও?

বিকাশ হেসে বললো, এখন অবশ্য বিয়ে করা ছাড়া তোমার করবার আর কিছু নেই—

শীলাও হাসলো, কিন্তু বিয়ে করবার মতো কাউকে এক্ষুনি তো আর পাচ্ছি না।

শীলার হাতে চাপ দিয়ে বিকাশ বললো, দু'মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু তারপর কী হবে তাই ভাবছি!

বিকাশের প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পেরে কিছু না বোঝবার ভান ক'রে শীলা জিজ্ঞেস করলো, তার মানে?

মানে আমার মতো সুপাত্র পেতে হ'লে তোমাকে আরও দু'মাস অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আরও দু'বছর অসীম ধৈর্যের সংগে আমাকে পুরোপুরি পাবার জন্যে কঠিন সাধনা করতে হবে, একটু থেমে বেশ গম্ভীর স্বরে বিকাশ জিজ্ঞেস করলো, পারবে?

শীলা হেসে ফেললো, না, অতো কাণ্ড ক'রে তোমার মতো সুপাত্র পাবার দরকার নেই আমার—

বাঃ, এর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে বেশ টনটনে জ্ঞান হয়েছে দেখছি, শীলার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিকাশ বললো, শীলা তুমি জানো আর দু'মাস পর আমি দু'বছরের জন্যে বিলেত চলে যাচ্ছি। যেতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই কিন্তু এক ছেলে আমি, আমাকে ছেড়ে থাকতে বাবার খুব কষ্ট হবে। তবু তাঁর সাধ আমাকে বিলেতে পাঠানো—

মৃদু স্বরে শীলা বললো, সে তো খুব ভালো কথা।

জানি না। তিনি চান আমাকে বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠাতে, আর তাঁর কথা আমাকে রাখতেই হবে—

শীলা আবার বললো, আরও ভালো কথা।

তাই বলছিলাম, বিকাশ শীলাকে স্পষ্ট বললো, মেসোমশাই যদি বাবার সংগে একবার কথা বলেন, তাহ'লে উনিও নিশ্চিন্ত হবেন আর তুমিও আমাদের বাড়িতে ব'সে কলেজের পড়া চালিয়ে যেতে পারবে।

লজ্জা পেয়ে শীলা বললো, আমি কিছু জানি না।

আমি আজ মেসোমশাই-এর সংগে কথা বলবো ব'লে এসেছিলাম। কিন্তু ওঁর সামনে আমার মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে যায়। এসব ব্যক্তিগত কথা তুলে ওঁর মত লোকের ধ্যান ভাঙাতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আর চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না শীলা, কবে বাবা অন্য কা'কে কথা দিয়ে ফেলবেন ঠিক নেই।

উনি আমার কথা কিছু জানেন ?

মেসোমশাইকে শ্রদ্ধা করেন খুব। আমি যে এ বাড়িতে ঘন ঘন আসি তাও জানেন। তুমি যে আছো সেকথাও শুনেছেন। তবে আমার সংগে তোমার সম্পর্কের কথা কে তাকে বলবে ? আমার যে মা নেই শীলা। একথা জানলে উনি নিশ্চয় অন্য কোথাও আমার বিয়ের চেষ্টা করতেন না।

অন্য কোথাও চেষ্টা করুন না তিনি, স্তিমিত স্বরে শীলা বললো, লেখা পড়া জানা কতো রূপসী মেয়ে পাবে তুমি, টাকাও পাবে কতো—

তা বটে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিকাশ বললো, সবই তো বুঝলাম, তাহ'লে বাবা চেষ্টা করুন যেখানে খুশি, কিন্তু আমার একটু মুস্কিল হয়েছে কি না !

কী মুস্কিল ?

এই একজন বিশেষ কাউকে বড়ো চেনা মনে হয়, সেই কাছের মানুষকে আরও কাছে পেতে চাই, শীলার হাত ধরে বিকাশ আস্তে আস্তে সত্যি তাকে কাছে টেনে আনতে লাগলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কী একটা জিনিশ নিতে ঘরে ঢুকলো সুলতা।

বিকাশের ওপর হঠাৎ রাগ হলো শীলার। তার যেন কিছুই খেয়াল থাকে না। মা'কে দেখতে পেয়ে শীলার মুখ সাদা হ'য়ে গেল। আর বিকাশ ? যেন কিছুই হয়নি এমন ভান ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে সুলতাকে নমস্কার ক'রে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন মাসিমা ?

ভালো। কতোক্ষণ এসেছো বিকাশ ?

অনেকক্ষণ। মেসোমশাই-এর সংগে ও ঘরে গল্প করছিলাম।

বিকাশের কথা যেন শুনতে পায়নি এমন ভাবে সুলতা বললো, যাবার আগে আমার সংগে দেখা ক'রে যেও, তোমাকে আমার কয়েকটা কথা বলবার আছে—

আমি এখুনি যাবো মাসিমা।

ও, শীলার দিকে ফিরে সুলতা বললো, তুমি তোমার বাবার ঘরে যাও শীলা।

শীলা চ'লে যেতে সুলতা দু'এক মিনিট কী যেন ভেবে নিলো। বোধ হয় ভাবলো বিকাশকে যা বলতে চায় তা' আজই বলা ঠিক হবে কি না। যদি বিকাশের সংগে শীলার মাখামাখি তার চোখে এমন স্পষ্ট হ'য়ে ধরা না পড়তো তাহ'লে হয়তো হাজার ইচ্ছে হলেও সুলতা এতো সহজে বিকাশকে সে কথা বলবার কল্পনা করতে পারতো না। কিন্তু আজ ওদের বাড়াবাড়ি রকম ঘনিষ্ঠতা তার ভালো লাগে নি। সুলতা জানে, দু'দিন পর বিকাশ বিলেত চলে যাবে। সে বড়োলোকের ছেলে। তার সংগে শীলার বিয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। মুখে যে যাই বলুক না কেন, সংসার চিনতে সুলতার বাকি নেই। ছেলের বিয়েতে রাসমোহন বাবু নিশ্চয়ই মোটা টাকা দাবী করবেন। টাকার অঙ্ক যা-ই হোকনা, সে-দাবী মেটাবার ক্ষমতা সুলতার নেই। কাজেই বিকাশের সংগে শীলার বিয়ের কথা ভাবা যেতে পারে না। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সুলতা লক্ষ্য করছে বিকাশ আর শীলার মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে উঠছে। অনেকবার সে ভেবেছে মেয়েকে একটু সতর্ক ক'রে দেবে। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারে নি। নিজেকে নিজের কাছে ছোটো মনে হয়েছে সুলতার। তা'ছাড়া বিকাশ শীলাকে পড়াতো। ওর সাহায্য না পেলে হয়তো শীলার পক্ষে পাশ করা কঠিন হ'তো। আজ সে ভাবলো, এখন না বললে একটা অঘটন ঘটে যেতে বিলম্ব হবে না। হয় তো বাবার মতের বিরুদ্ধে শেষ অবধি বিকাশ শীলাকে বিয়ে করবে। কিন্তু কী লাভ হবে তা'তে? নিঃসন্দেহ বিকাশ তাহ'লে বাপের আশ্রয় হারাবে এবং বিকট দারিদ্র্যের মধ্যে গিয়ে পড়বে। যে ঝড় সুলতার জীবনের ওপর দিয়ে ব'য়ে চলেছে, সমস্ত জেনে শুনে তার ঝাপ্টা শীলার গায়ে কিছুতেই সে লাগতে দেবে না। তার চেয়ে

বিয়ে না ক'রে তার মেয়ে চাকরি করুক—সব দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা অনেক ভালো মনে হয় সুলতার। বিকাশের সংগে যখন শেষ অবধি শীলার বিয়ের আশা নেই তখন শুধু শুধু এতো কম বয়সে তার স্বপ্ন দেখবার কী দরকার। দুর্নাম ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না তা'তে।

দেখ বিকাশ, থেকে থেমে সুলতা বললো, আমরা গরিব মানুষ। এমনিতেই আমাদের অনেক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়—

সুলতার কথা শুনে বিকাশ ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বললো, এসব কথা কেন বলছেন মাসিমা?

তুমি কিছু মনে ক'রোনা, ঠিক তেমনি স্বরে সুলতা আবার বললো, জেনে শুনে আমার মনে হয় না আর অসুবিধা বাড়ানো উচিত?

সুলতা কী বলবে বুঝতে না পেরে বিকাশ অসীম কৌতূহল নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো শুধু।

শীলা এখন বড়ো হয়েছে, সুলতা যেন দেয়ালকে লক্ষ্য ক'রে কথা বলছে, তুমিও দু'দিন পরে বিয়ে ক'রে বিলেত চ'লে যাবে—

বিকাশ বললো, আমিও শীলাকে সেকথা বলছিলাম মাসিমা।

তাই মনে হয় তোমাদের মেলা মেশা আর ভালো দেখায় না। বোঝো তো আমাদের বেশি পয়সা নেই, আর শীলাও একটা অপরূপ রূপসী নয়। তাই তার নামের সংগে তোমার নাম আর পাঁচজনকে উচ্চারণ করবার সুযোগ দেয়া বোধ হয় উচিত নয়।

এতোক্ষণ পর বিকাশ বুঝতে পারলো সুলতা কী কথা তাকে বলতে চায়। সে ভাবতে পারেনি এমন স্পষ্ট ভাষায় সুলতা এ ইংগিত করবে। বস্তুত এ বাড়িতে বিকাশ কমলেশের সংগে আলাপ করবার জন্যেই প্রথম এসেছিলো। তারপর তার মতো লোকের স্নেহ পেয়ে নিজেকে মনে করলো সৌভাগ্যবান। এবং দিনে দিনে শীলার সংগে তার ঘনিষ্টতা হ'লো।

তবু যাই হোক না কেন, সে কখনও কল্পনা করেনি এমন তুচ্ছ কথা এ বাড়ির কোনো লোকের কাছ থেকে তাকে শুনতে হবে। কমলেশকে সে অসাধারণ মানুষ ব'লে মনে করে। তার সংগে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় হ'লে নিজেকে ধন্য মনে করবে বিকাশ। সুলতা কেমন ক'রে ভাবতে পারলো তাকে দিয়ে এ পরিবারের কোনো ক্ষতি হ'তে পারে। যদি একান্তই কিছু হয় তাহ'লে বিকাশ যে সব বাধা তুচ্ছ ক'রে এদের উপকার করবে সেকথা কী সুলতা জানে না !

বিকাশ যে সুলতার কথা শুনে আহত হয়েছে সে-ভাব যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টা ক'রে বললো, মাসিমা, আজ আমি মেশোমশাইকে বাবার সঙ্গে আলোচনা করবার কথা বলবো ব'লে এসেছিলাম—

কিসের আলোচনা ?

কয়েক মিনিট ইতস্তত ক'রে বিকাশ বললো, মানে, বাবার ইচ্ছে আমার বিয়ে দিয়ে আমাকে বিলেত পাঠান, কয়েকটা ঢোঁক গিলে, কোনো রকমে সে ব'লে ফেললো, তাই বলছিলাম মেসোমশাই যদি শীলার কথা বাবাকে বলেন—

দৃঢ়স্বরে সুলতা বললো, তা হয় না বিকাশ। তোমার বাবা বোধ হয় জানেন না আমাদের একটি পয়সাও নেই।

না না, তা'তে কিছু যায় আসে না মাসিমা, বাবা সে রকম লোক নন—

তিনি যেমন লোক হোন, সুলতা কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে সহসা কথা ঘুরিয়ে নিলো, তুমি ছেলে মানুষ, তোমাকে আমি সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, তোমার বাবা এক পয়সাও যদি না চান তাহ'লেও এতো অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কিছুতেই শীলার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবো না। তাই তুমি আর এ বাড়িতে

এসে শীলার সংগে অকারণ ঘনিষ্টতা ক'রে আমাদের অসুবিধা বাড়িয়ে তুলো না—

বিকাশের সমস্ত শরীর কাঁপছিলো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না সে। সে বুঝতে পারছিলো এখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। কিন্তু তার চলবার ক্ষমতা যেন হারিয়ে গেছে। বিকাশ নড়তে পারছিলো না।

ঘরের বাইরে বেরিয়েই স্থলতা শীলাকে দেখতে পেলো। সে দূরে যায় নি। কান পেতে এদের কথাবার্তা শুনছিলো। আর তার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠছিলো শুধু।

তাকে দেখতে পেয়ে কঠিন স্বরে স্থলতা বললো, লজ্জা করে না তোমার? জানো না তোমার বাবার ক্ষমতা কতো? কোন সাহসে তুমি চাঁদ ধরতে যাও? নিজেদের অভাবের কথা দেশ সুদ্ধ লোককে না জানালে আর চলছেনা না? এখনও বুঝি বোঝোনি রাজকন্যা তুমি নও?

শীলার গাল বেয়ে চোখের জল প'ড়ে যেতে লাগলো শুধু।

তিন

লেখার মাত্রা আর একটু বাড়াতে পারলে হয়তো কমলেশের এতো অভাব থাকতো না। ভালো প্রকাশকের অভাব নেই আজকাল, আশাতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতেও তারা কার্পণ্য করে না। কিন্তু কমলেশ কিছুতেই বেশি লিখতে পারে না। অনেক ভেবে, অনেক কাটাকাটি ক'রে তাকে লিখতে হয়। আর নিজে তৃপ্ত না হ'লে কিছুতেই সে বই প্রকাশ করবার জন্যে দেয় না।

এই কারণে তার অন্যান্য লেখক বন্ধুরা তাকে প্রায়ই নানা উপদেশ দেয়। তারা বলে এমন ক'রে চললে কমলেশ কোনোদিনই কারোর কাছ থেকে কিছু পাবে না। না পাবে প্রকাশকের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ, না পাবে পাঠক সাধারণের কাছ থেকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি। তাহ'লে তার এতো ভেবে এতো কম লিখে কী লাভ। এখন বাংলা দেশে নানা ধরনের লেখকের সংখ্যা এতো বেশি বেড়েছে যে সর্বক্ষণ পাঠকের চোখের সামনে না থাকলে তারা লেখককে ভুলে যায়। তাই সব সময় ভালো মন্দ বিচার না ক'রে লেখকের উচিত শুধু লিখে যাওয়া। তাহ'লে অর্থ এবং নাম দু-ই পাওয়া যায়।

এ সব কথা কমলেশ যে নিজেও ভেবে দেখেনি তা'নয়। অনেক সময় তার মনে হয়েছে তার লেখার মাত্রা আরও অনেক বেশি বাড়ানো উচিত। সে চেষ্টা করতে বাকি রাখেনি। কিন্তু শেষ অবধি তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে কিছুতেই সে নিজেকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যা-ই ক'রে থাকুক না কেন, কমলেশ এই

ভেবে মনে মনে গর্ব অনুভব করে যে নিজেকে কোনোদিন সে প্রবঞ্চনা করে নি। হাজার অভাবের মধ্যে থাকলেও সাহিত্যের মাধ্যমে নাম কিংবা অর্থের প্রলোভনে কাউকে ঠকাবার চেষ্টা করেনি কোনোদিন। যদি জীবনের শেষ দিনেও তার বাইরের অভাব না ঘোচে, একটি লোকও তাকে না বোঝে তবু দুঃখ হবে না কমলেশের। শুধু এই কথা ভেবে মনের মাঝে সে প্রচুর সান্তনা পাবে যে নিজের কাছে নিজে খাঁটি থেকেছে চিরদিন।

আজ তাকে তার বন্ধুরা নানা কথা বোঝালেও কমলেশ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, লোককে ঠকিয়ে শেষ অবধি কারোর চলে না। ধরা তাকে একদিন পড়তেই হয়। লেখক যা খুশি নিরন্তর লিখে গেলে তার নিঃসন্দেহে অর্থ হয়, নামও পরিচিত ও মাঝে মাঝে প্রশংসিত হয় পাঠক মহলে। কিন্তু শেষ অবধি কী পায় তারা? অকস্মাৎ একদিন দেশ সুদ্ধ লোকের সামনে তাদের মুখোস খুলে পড়ে। তখন তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নাম, অর্থ কিছুই কমলেশের না হোক, ক্ষতি নেই, কিন্তু কেউ যেন কোনোদিন তাকে সুলভ প্রশংসার কাঙাল মনে ক'রে অবহেলা না করে।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে তার নানা কথা মনে হয়। কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়লে আমরা বিস্মিত হই, বিচলিত হই। চারপাশের লোকেরা কিছুদিন প্রচুর উৎসাহে বাজের কথা আলোচনা করে। কিন্তু দিনে দিনে ঘোর কেটে যায়, বিস্ময় ঘুচে যায় আর আলোচনাও জুড়িয়ে যায়। অথচ আলো আর বাতাস—আমাদের প্রতি মুহূর্তের সংগী। তাদের না হ'লে আমাদের এক মিনিটও চলে না। কিন্তু এই ভেবে কমলেশের ভালো লাগে, তারা আমাদের বিস্ময় জাগায় না, বিমূঢ় ক'রেও রাখে না, তাই আমরা আলো বাতাসের আলোচনায় মুখর হই না। কিন্তু তবু তারা আমাদের নিত্যকালের সংগী।

কিছু লিখতে গেলেই কমলেশের হঠাৎ অকারণে আলো বাতাসের কথা মনে হয়। তাই নানা উদ্ভট আজগুবি কল্পনা ক'রে চমক লাগানো গল্প উপন্যাস লিখে দু'দিনের জন্য বাহবা পাওয়ার ব্যাপারে তার মন কিছুতেই সায় দেয় না। সে আজ অবধি জীবনে যা কিছু লিখেছে, যতো লিখেছে, তার মধ্যে কোথাও সামান্য চমক লাগাবার প্রচেষ্টা নেই। খুব সহজ ভাবে সে জীবনের গভীরে যাবার চেষ্টা করেছে, সূক্ষ্ম সমবেদনায় মানুষকে বোঝবার চেষ্টা করেছে। হয়তো তা' করেছে বলেই লোকে তাকে নিয়ে কলরব করে নি, কিন্তু নিঃশব্দে মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। তার প্রমাণ কমলেশ অনেক জায়গা থেকে, অনেকের কাছ থেকে বারবার পেয়েছে আর মনে মনে ভেবেছে সার্থক তার সাধনা। আর কিছু যদি সে না পায় তা'তে ক্ষতি নেই, সে এর মধ্যেই যা'পেয়েছে তাই বা ক'জন লেখক পায়!

শুধু সাহিত্যের ব্যাপারে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও কমলেশের এতোটুকু চমক নেই। আড়ম্বর তাকে আচ্ছন্ন করে না, পার্থিব ঐশ্বর্য তার মন টানে না, নিজের মনের কোথাও সামান্য দৈন্য তার নেই। ছোটো ঘর ছেড়ে সে বেরোতে চায় না, তার মনে হয় অন্য পরিবেশে রাজকীয় আড়ম্বরে কেউ যদি তাকে নিয়ে যেতে চায় তাহ'লে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাবে, সে ফুরিয়ে যাবে, আর এক লাইনও লিখতে পারবে না।

সে দিন সকাল বেলা লিখতে ব'সে কমলেশের মনে এমনি নানা কথা ভিড় করছিলো। সংসারের অনেক দায়িত্ব তার সামনে। এখন সে কী করবে! আসছে মাস থেকে উপার্জনের মাত্রা না বাড়ালে শীলার কলেজে পড়া হবে না। একটি মাত্র মেয়ে তার। তাকে পূর্ণ শিক্ষা দিতে না পারা তার পক্ষে অশোভন। সুলতাকে সে কথা দিয়ে দিয়েছে। শীলাকে যতো শিগগির হয় কলেজে ভর্তি করতে হবে।

অথচ এদিকে কমলেশ এক দীর্ঘ উপন্যাস আরম্ভ করেছে। সেটা শেষ

করতে তার বেশ কিছুদিন দেরি হবে। প্রকাশকের কাছ থেকে তার মাসে মাসে যে টাকা পাবার ব্যবস্থা আছে, নতুন বই না দিয়ে তা' আর বাড়ানো যাবে না। তা ছাড়া সংসারের ছোটো খাটো দাবী মেটাবার জন্যে তাকে মাঝে মাঝে নানা সাময়িক পত্রিকায় ছোট গল্প কিংবা প্রবন্ধ লিখতে হয়। কিন্তু তার ওপর ভরসা ক'রে শীলাকে কলেজে ভর্তি করা চলে না। কী যে হয়েছে কমলেশের কয়েক মাস থেকে অনেক চেষ্টা করেও সে ছোটো কিছুই লিখতে পারে নি। তাই যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে সংসারের। সুলতাকে পাওনাদারদের কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে।

ভাবতে ভাবতে কমলেশের মাথার মধ্যে সহসা যেন আগুন জ্ব'লে ওঠে। কেন সে লেখক না হ'য়ে অন্য কিছু হ'তে পারলো না। তাহ'লে হয় তো অভাব এমনি ক'রে তাকে কটাক্ষ করতে পারতো না। তার ইচ্ছে করে সব বই কাগজ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে সাধারণ বুদ্ধির মানুষ হ'য়ে উঠতে। এক লাইনও না লিখে টেবিলের ওপর মাথা রেখে বিষণ্ন কমলেশ ভাবতে আরম্ভ করে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে চোরের মতো পা টিপে টিপে কমলেশের ঘরে এসে শীলা দেখলো হাওয়ায় টেবিল থেকে কাগজ পত্র উড়ে যাচ্ছে।

একটি একটি ক'রে কাগজগুলো তুলে টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে শীলা আস্তে ডাকলো, বাবা ?

মাথা তুলে কমলেশ বললো, কী রে ?

তুমি এখন ঘুমোচ্ছ ? অসুখ করেনি তো ? তার কপালে হাত দিয়ে শীলা বললো, না গা তো ঠাণ্ডা একেবারে।

কমলেশ হেসে বললো, না, না কিছু হয় নি, এমনি বিশ্রাম করছিলাম।

প্রথম শরতের স্তিমিত সকাল। হাল্কা রোদ্দুর উঠেছে। দূরে মনে

হয় কুয়াশা জমে আছে। এখনো পূজো আসতে অনেক দেরি। তবু বাইরে তাকালে পূজোর সকাল ব'লে মনে হয়।

ক'দিন ধ'রে কমলেশ লক্ষ্য করছে রোজ সকালে শীলা তার ঘরে এসে চুপ চাপ ব'সে থাকে। কোনো কথা বলে না, একটা বই হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে শুধু তার দিকে তাকায়, না হ'লে মাথা নিচু ক'রে বই পড়ে।

আজ কমলেশের লেখার মেজাজ নেই। তাই সে শীলার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো। কী বেড়ে উঠেছে সেদিনকার সেই ছোট্ট মেয়েটি। ছেলেবেলায় সে ভারী বিরক্ত করতো কমলেশকে। সে না খাইয়ে দিলে দুধের বাটি উল্টে ফেলে চিৎকার করে কাঁদতো। তার সংগে বেশিক্ষণ আজে বাজে না বকলে ঘরে এসে তার লেখার ওপর হিজি বিজি কাটতো, কাগজপত্র টান মেরে ছিঁড়ে একাকার ক'রে দিতো।

কমলেশ তাকিয়ে দেখলো, বেড়ে উঠলেও শীলার চেহারা বেশ খারাপ হ'য়ে গেছে। চোখ দু'টো ব'সে গেছে, গালের মাংস ঝ'রে গেছে যেন। একটু আগে শীলা কি কাঁদছিলো ? ওর চোখ অমন ছলোছলো কেন ?

কমলেশ জিজ্ঞেস করলো, তোর চেহারা এতো খারাপ দেখাচ্ছে কেন ? এখন তো পড়াশুনোর কোনো চাপ নেই, ভালো ক'রে খাওয়া দাওয়া করিস না নাকি ?

করি বাবা।

অনেকক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কমলেশ আবার জিজ্ঞেস করলো, মা বকেছে নাকি শীলা ?

না, অবাক হ'য়ে শীলা বললো, বকবে কেন ?

কমলেশ হেসে বললো, তোর চোখ যে ভিজে দেখাচ্ছে, মনে হয় কাঁদছিলি—

লজ্জা পেয়ে শীলা তাড়াতাড়ি বললো, না বাবা আমার কিছু হয়নি। আমি কাঁদিনি তো।

শীলা কিছু না বললেও তার মুখ দেখে কমলেশ বুঝতে পারলো যে একটা কিছু তার কাছে গোপন ক'রে গেল। কিন্তু কী এমন হ'তে পারে শীলার!

হাতের কাছে কাগজ সাজিয়ে কলম খুলতে খুলতে কমলেশ বললো, বিকাশ অনেকদিন আসে না কেন রে? ওর কী কোনো পরীক্ষা আছে নাকি?

না বাবা, এখন আবার পরীক্ষা কি?

তাহ'লে?

শীলা উত্তর দিলো না। মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

লিখতে লিখতে যেন আপন মনে কমলেশ বললো, বই দিয়ে গেল, বললো আমার কেমন লাগলো জানতে আসবে, ব্যস তারপর একেবারে উধাও, একটু থেমে খুব সহজ স্বরে সে বললো, ঝগড়া করিস নি তে তোরা?

না না—

তাহ'লে আমার মনে হয় ওর একটা খবর নেওয়া দরকার, অসুখ—বিসুখ করেছে বোধ হয়—

কমলেশের কথা শেষ হবার আগেই শীলা হঠাৎ বলে ফেললো, মা ওকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করেছে বাবা।

কমলেশের কলম থেমে গেল। বিস্মিত দৃষ্টিতে শীলার দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করলো, কেন?

শীলা কী যেন বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার কথা বলবার আগেই কমলেশের চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুলতা ঘরে ঢুকলো। টেবিলের ওপর কাপ রেখে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু কমলেশ ডাকলো, শোন?

কী বলছো?

কমলেশ সুলতাকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলো, তুমি বিকাশকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করেছো ?

কমলেশের কথার উত্তর না দিয়ে শীলার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুলতা বললো, সকাল থেকে বাবার সংগে আজে বাজে না বকে সংসারের কাজে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো না ?

কমলেশ শান্ত স্বরে আবার বললো, আমার কথার উত্তর দাও। বিকাশকে তুমি আসতে বারণ করেছো ?

হ্যাঁ করেছি।

কী অপরাধ করলে সে ?

তুমি কি আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছো ?

না, গম্ভীর স্বরে কমলেশ বললো, একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে যখন বাড়ি থেকে চ'লে যেতে বলেছো তখন নিশ্চয়ই কোনো সাংঘাতিক অপরাধ সে করেছে। কী তার অপরাধ শুধু সেই কথাটা জানতে চাইছি।

সুলতা বললো, শীলা তুমি রান্না ঘরে যাও, তারপর কমলেশের দিকে ফিরে বললো, আমি চাই না শীলা ওর সংগে আর মেলামেশা করে। এই উঠতি বয়স, বেশি দূর এগোনো ভালো নয়—

অবাক হ'য়ে কমলেশ বললো, শুধু এই কারণে আমার অতো বড়ো স্নেহের পাত্রের কাছে তুমি এতো কঠিন হ'তে পারলে ?

হ্যাঁ, সুলতা একটু কঠিন স্বরে বললো, ব্যাপারটা অনেকদিন থেকেই আমার ভালো লাগছিলো না। তাই এখন ওদের মেলামেশা বন্ধ না ক'রে দিলে পরে কারোর পক্ষেই আর কিছু করা সম্ভব হতো না।

কিন্তু সুলতা, পরের কথা তুমি এখন থেকেই ভাবতে আরম্ভ করলে কেন ? পাত্র হিসেবে বিকাশ তো খারাপ নয়, সাধারণের চেয়ে বরং অনেক ভালো—

ওসব অসাধারণ প্রতিভার কথা ভেবে সময় নষ্ট করলে আর আমার চলবে না। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে প্রতিভার দাম আমাকে দিতে হচ্ছে মা হ'য়ে কোন প্রাণে মেয়েকেও আমি সে-জীবন বেছে নিতে সাহায্য করি বলতে পারো?

কিন্তু তোমার মতো মতামত তো শীলার নাও হ'তে পারে। আমার মনে হয় বিকাশকে পেয়ে সে সুখী হবে।

সুলতা বললো, শীলার এখন যা' বয়স তা'তে শুধু প্রতিভার পূজো করে জীবন কাটাবার কল্পনা করা ওর পক্ষে বিচিত্র নয়। কিন্তু আমি থাকতে আমার মেয়েকে সে— ভুল করতে আমি দেবোনা—কিছুতেই না—

কমলেশ বললো, তুমি একটু ভুল করছো সুলতা, কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে আবার বললো, বিকাশ বড়ো-লোকের ছেলে তাকে বিয়ে করলে তোমার মতো অর্থের কষ্ট শীলার কোনো কারণেই হবার কথা নয়—

বাধা দিয়ে সুলতা বললো, একটা কথা তুমি জেনে রেখো তোমার কথায় মুখ বুজে আগের মতো আমি আর কোন কাজ করবোনা। আমি মনে প্রাণে বুঝেছি তোমার ওপর ভরসা করে থাকলে ভবিষ্যতে শুধু জটিলতার সৃষ্টি হবে, স্বামীর বিস্মিত মুখের দিকে একবার দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে সে আবার বললো, সংসারের ভালো মন্দ বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমার কোনদিনও হবেনা—

গম্ভীর স্বরে কমলেশ জিজ্ঞেস করলো, কী বলতে চাও তুমি?

আমি বলতে চাই, সুলতার দৃষ্টিতে জ্বালা ফুটে উঠলো, কোন সাহসে তুমি তোমার মেয়ের সংগে বিকাশের মতো ছেলের বিয়ের কথা ভাবতে পারো?

কেন ভাববোনা? শীলা দেখতে এমন কিছু খারাপ নয়—

আঃ, বিরক্ত হ'য়ে সুলতা বললো, এইটুকু বোঝবার মতো সামান্য বুদ্ধি

কি তোমার হবেনা ? রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধির কথা এখানে আসছে না। এ সব ব্যাপারে সবচেয়ে আগে যা দরকার তোমার তা নেই।

কিছু বুঝতে না পেরে কমলেশ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কিসের কথা বলছো সুলতা ?

টাকার কথা। এক ছেলে বিকাশ। তুমি বুঝতে পারোনা তার বিয়েতে তার বাবা কি পরিমাণ টাকা দাবী করবে ?

কমলেশ উত্তর দিলনা।

সুলতা আবার বললো, পরিমাণের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের কোন দরকার নেই, যা অবস্থা হয়েছে মেয়ের বিয়েতে কানাকড়িও তুমি এখন খরচ করতে পারবেনা সে-কথা তোমার মনে থাকে না কেন ?

কী ভেবে কমলেশ বললো, টাকার কথা সবচেয়ে বড়ো নয়। বিকাশের দিকে চেয়ে তার বাবা আমাদের কাছে অন্যায় দাবী করতে পারেন না—

ন্যায় অন্যায়ের কথা নয়। তিনি যদি কিছুই দাবী না করেন তবুও তুমি কি এখন শুধু মেয়ের বিয়ের খরচ যোগাড় করতে পারো ?

এই মুহূর্তে বিয়ের কথা তো উঠছেনা। সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে শুধু শুধু তুমি বিকাশের ওপর অবিচার করলে—

উত্তেজিত স্বরে সুলতা বললো, আমার ভুল ধরবার চেষ্টা তুমি করোনা। আমি ঠিক করেছি। এই মুহূর্তে বিয়ের কথা উঠবেই বা না কেন ? জানো না বিকাশ দু'দিন পরে বিলেত চলে যাচ্ছে, যাবার আগে ওর বাবা ওর বিয়ে দিতে চান—

বিয়ে দিতে চাইলেই বিকাশ বিয়ে করবে কেন ? তখন শীলার কথা সে তার বাবাকে বলবে ? আমি তো আগেই বলেছি বিকাশ সাধারণ ছেলে নয় যে টাকার জন্যে জীবনের সত্যকে বিনা প্রতিবাদে তুচ্ছ করবে।

সুলতা হঠাৎ হেসে উঠে বললো, এসব ছেলেমানুষী কথা তুমি আমাকে আর শুনিও না। তোমার মুখ থেকে এমন কথা আমি অনেকদিন থেকে শুনে আসছি। কিন্তু কথা শেষ অবধি কথাই থেকে যায়, তা ব'লে তোমার কী লাভ হয় বুঝতে পারিনা কিন্তু আমার কোনো কাজ হয়না তার প্রমাণ আমি এর মধ্যে অনেকবার পেয়ে গেছি—

কমলেশকে আর কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে সুলতা রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

কমলেশ গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো তারপর একসময় বুঝতে পারলো আজ সে আর এক লাইনও লিখতে পারবেনা। সে ঠিক করলো এখুনি বেরিয়ে পড়বে। যদি সুযোগ হয় তাহ'লে বিকাশের বাবার সংগে শীলার কথা আলোচনা করবে। কিন্তু শুধু সেই কারণে বিকাশদের বাড়িতে যাচ্ছেনা কমলেশ। সে যাচ্ছে বিকাশকে ফিরিয়ে আনতে। সুলতা তাকে যাই বলুকনা কেন, কমলেশের মনে হ'লো বিকাশের সংগে সে অকারণে অভদ্রতা করেছে। সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারের কল্পনা ক'রে কিংবা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভেবে আর একজনকে আঘাত দেয়ার কোনো অর্থ হয়না কমলেশের কাছে। আজ অবধি বিকাশের কোনো দোষ সে দেখতে পায়নি। শীলার কথা ভেবে যদি তার মনে কোনো দুর্বলতা জেগে ওঠে—তা'এতো স্বাভাবিক আর সংগত যে সে তার মধ্যে কোনো অন্যায় খুঁজে পায় না। পরে নানা কারণে দৈবদুর্বিপাকে যদি আজকের সত্য মিথ্যা হ'য়ে যায় তার জন্যে কে দায়ী, সে—বিচার হবে তখন। সে কথা ভেবে, শুধু নিজের জেদ বজায় রাখবার জন্যে আজ একজনকে আঘাত করলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বড়ো হয়ে ওঠেনা।

কমলেশ বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলো।

বিকাশদের বাড়িতে এর আগে কমলেশ কখনও যায়নি। সে তাকে অনেক বার অনুরোধ করেছে কিন্তু কমলেশ বাড়ি থেকে সহজে বার হ'তে চায় না। তাই আজ কাল ক'রে ক'রে শেষ অবধি আর যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি।

বিকাশদের বাড়ির কাছাকাছি এসে কমলেশ ইতস্তত করতে লাগলো।

শীলার বিয়ের কথা ভেবে তার হাসি পেলো। একথা এখন মনে হওয়া উচিত নয়। শীলার এখন এতো কম বয়স যে তার বিয়ের কল্পনা করা কমলেশের পক্ষে কঠিন। যদি সুলতা আজ তাকে রূঢ় বাস্তবের কথা না স্মরণ করিয়ে দিতো তাহ'লে হয় তো কমলেশ একথা ভাবতেই পারতো না।

আসলে কমলেশ কল্পনা বিলাসী নয়। কিন্তু সে ধৈর্যশীল। সে জানে মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম কখনও বিফল হয় না। আজ তার সংসারে নানা বাধা আর অসুবিধা থাকলেও যথা সময়ে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

তাই সব চেয়ে আগে কমলেশ প্রস্তুত হ'য়ে নিতে চায়। সেও চায় শীলা আরও পড়াশুনো করুক, নানা দেশের রচনার মধ্যে দিয়ে জীবনকে জানুক—তার বুদ্ধি পরিণত হোক। কিন্তু সুলতার রূঢ় কথাবার্তায় আজ-কাল তার সব কিছুই যেন গোলমাল হ'য়ে যায়। তাই থেকে থেকে কমলেশের মনের কোথায় ব্যথা বাজে।

বিকাশদের বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই কোথা থেকে বিকাশ ছুটে এলো। এ সময় এখানে তাকে সে আশা করে নি। কিন্তু তবু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো সব শুনে কমলেশ কিছুতেই স্থির থাকতে পারবেন না—নিশ্চয়ই তাকে যাবার জন্যে চিঠি লিখবে।

বিকাশকে দেখতে পেয়ে কমলেশ বললো, তোমার কাছেই এলাম বিকাশ, আমার আরও আগে আসা উচিত ছিলো। কিন্তু আমি কিছু জানতাম না। আজ শীলার কাছে শুনলাম—

লজ্জা পেয়ে বিকাশ বললো, আমাকে খবর দিলেই আমি যেতাম। আপনি শুধু শুধু কষ্ট করলেন।

কষ্ট আর কি, অনেকদিন থেকেই তো তোমাদের এখানে আমার আসবার কথা। হয়তো আসতে আরও অনেক দেরি হ'য়ে যেতো, আজ এই সুযোগে আসা হ'য়ে গেল।

আসুন আসুন, বিকাশ ব্যস্ত হ'য়ে কমলেশকে নিয়ে এগিয়ে গেল, বাবা বাড়িতেই আছেন। তাঁর সংগে আগে আপনার আলাপ করিয়ে দি—

চল। কিন্তু একটা কথা প্রথমেই ব'লে রাখি বিকাশ, একটু থেমে কমলেশ বললো, তুমি আমাদের ওখানে যেমন যেতে আবার ঠিক তেমনি যাবে। আমাদের ওপর রাগ ক'রে থেকোনা যেন—

না না, রাগ কি, আর মাসিমা তো কিছু অন্যায় কথা বলেন নি—

কমলেশ হাসলো, তোমার বাবার সংগে আমি আজ সব ন্যায়—অন্যায়ের কথা আলোচনা করবো ব'লে এসেছি।

বিকাশের বাবা রাসমোহন বাবু গম্ভীর স্বভাবের লোক। স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি যেন আরও রাশভারী হ'য়ে উঠলেন। নিজের ব্যবসার কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা ভাবতেন না। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে সব সময় বিশৃঙ্খল সংসারের কথা ভুলে থাকবার চেষ্টা করতেন। আত্মীয় আত্মীয়ার সংগে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিলোনা। যারা রাখবার চেষ্টা করেছে তাদের উদ্যম ব্যর্থ হয়েছে। যন্ত্রের মতো তিনি যেন শুধু কর্তব্য পালন ক'রে যান। বিকাশকে মানুষ করা ছাড়া তাঁর আপাতত আর কোনো চিন্তা নেই।

এমনি এক সংসারে বিকাশ মানুষ হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাই বাড়িতে তার কোনো আকর্ষণ ছিলো না। বলতে গেলে সারা দিনে

বাবার সংগে তার কথাই হয় না—মাঝে মাঝে শুধু প্রয়োজনীয় টুকরো টুকরো কথার বিনিময়ে দিন কেটে যায়।

বিকাশ যে রাসমোহন বাবুকে ভয় করে তা নয়। তবু দু'জনের মাঝখানে যেন একটা প্রাচীর আছে। একজন ব্যবসায়ী, আর একজন কবি। মাঝে মাঝে বিকাশের মনে হয়, আজ তার মা বেঁচে থাকলে হয়তো এই বাড়ি তার কাছে একেবারে অন্য রকম মনে হ'তো।

যখন তার মনে কোনো কল্পনা জাগে কিংবা অকারণ উচ্ছ্বাসে ছোটো ছেলের মতো অবান্তর কথা বলতে ইচ্ছে করে তখন তার মা'র কথা মনে পড়ে যায়। আর বাড়িতে ঢুকে মনে হয় চারপাশে যেন শুকনো কঠিন আবরণ পাতা রয়েছে। তখন বাবাকে তার ভালো লাগে না। ছোটো ভাই বোনের অভাব বড়ো বেশি বোধ করে সে।

কিন্তু বয়সের অনেক তফাৎ থাকলেও কমলেশ বিকাশের এই অভাব দূর করতে পেরেছিলো। ওই বাড়ির প্রত্যেকে তাকে এমন কিছু দিয়েছিলো যে সেখানে তার সময়ে—অসময়ে যেতে ইচ্ছে করতো। কমলেশের সংগে প্রাণ খুলে সে আলোচনা করতো, সুলতার কাছে নানা আব্দার করতে তার বাধতো না, আর শীলাকে একান্ত আপনার মনে হ'তো। রাসমোহন বাবু শীলার সংগে বিকাশের সম্পর্কের কথা ছাড়া আর সব কথাই জানতেন।

বিকাশ যখন কমলেশকে নিয়ে রাসমোহন বাবুর ঘরে ঢুকলো তখন সামনে একটা মোটা ফাইল নিয়ে তিনি কী যেন লেখবার চেষ্টা করছিলেন। বিকাশ আর কমলেশকে আসতে দেখে মাথা তুললেন।

বিকাশ শুধু বললো, বাবা কমলেশ বাবু এসেছেন—তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না রাসমোহন বাবু। কমলেশের নাম শোনবার সংগে সংগে তাঁর মুখ উজ্জল হ'য়ে উঠলো। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

আসুন আসুন, আমার কী সৌভাগ্য আপনি আমার এখানে এসেছেন! বিকাশের কাছে আপনাদের কথা এতো শুনি—

কমলেশ হেসে বললো, ব্যস্ত হবেন না। অনেকদিন থেকে আপনার সংগে আমার আলাপ করবার ইচ্ছে ছিলো। বিকাশের মতো বুদ্ধিমান ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। আমি ওকে খুব স্নেহ করি।

রাসমোহন বাবু বললেন, বিকাশের ভাগ্য ভালো যে আপনার মতো লোকের স্নেহ পেয়েছে—কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন কমলেশ বাবু, বসুন!

বিকাশ পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। তার দিকে তাকিয়ে কমলেশ বললো, অনেক দিন ওর কোনো খবর পাইনি তাই আমি আজ নিজেই জানতে এলাম ও কেমন আছে।

মোটা ফাইল সামনে থেকে সরিয়ে রেখে রাসমোহন বাবু বললেন, আমি জানি আপনারা বিকাশের জন্যে অনেক করেন। কতোদিন ওকে বলেছি আমাকেও একদিন সংগে ক'রে নিয়ে যেতে কিন্তু বোধ হয় আপনাকে বিরক্ত করা হবে ব'লে ও ইতস্তত ক'রে শেষ অবধি আর নিয়ে যেতে পারে নি।

প্রাণখোলা হাসি হেসে কমলেশ বললো, বিরক্ত আর কি, এরপর একদিন আসবেন, এখন তো আলাপ হ'লো।

নিশ্চয়ই যাবো, রাসমোহন বাবু বিকাশকে কমলেশের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। কমলেশ ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। আর কিছুই তার চোখে পড়লো না শুধু দেয়ালে টাঙানো একটি বড়ো ছবি সে বারবার দেখতে লাগলো।

বিকাশের মা'র ছবি, রাসমোহন বাবু বললেন, সে আর নেই তাই সব সময় আমি ঠিক বুঝতে পারি না বিকাশ কখন কী চায় না চায়। যে

বাড়িতে কোনো মেয়ে নেই সেখানে থাকার কী কষ্ট সে কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন।

কমলেশ বললো, তবু বিকাশের কোনো অভাব আপনি রাখেন নি, শুনলাম শিগগিরই ওকে বিলেত পাঠাচ্ছেন—

হ্যাঁ খুব শিগগির। কোনদিন আছি কোনদিন নেই, তাই আমার কর্তব্য একেবারে শেষ ক'রে যেতে চাই।

কমলেশ প্রশ্ন করলো, কবে যাবে বিকাশ?

আর মাস দু'য়েকের মধ্যেই, ওর বিয়েটা তার আগে দিয়ে দিতে চাই কমলেশ বাবু। তা না হ'লে এ বাড়িতে আমার দম বন্ধ হ'য়ে যাবে—

সুযোগ বুঝে কমলেশ বললো, ওর জন্যে কোনো মেয়ে দেখেছেন কি?

দেখছি। তবে, হঠাৎ খুব জোরে হেসে রাসমোহন বাবু বললেন, ছেলের বিয়ে করতে খুব ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। আজকালকার ছেলে, নিজেই কিছু ঠিক ক'রে ব'সে আছে কি না বুঝতে পারি না। এ সময় ওর মা বেঁচে থাকলে আমাকে কিছু ভাবতে হ'তো না।

কমলেশ হেসে বললো, ওকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলেই তো পারেন?

কী দরকার? যথা সময়ে ও নিজেই বলবে। আর অস্পষ্ট ব্যাপারের স্পষ্ট উত্তর ছেলেরা বাপকে সহজে দিতে চায় না কমলেশ বাবু।

রাসমোহন বাবুর কথা শুনতে শুনতে কমলেশ ভাবছিলো শীলার কথা কেমন ক'রে তোলা যায়। হাজার হ'লেও সে মেয়ের বাপ। সমস্ত সঙ্কোচ ভুলে এই মুহূর্তে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত না করে ফেললে ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবে। পরে আবার নতুন ক'রে আরম্ভ করা কঠিন হ'য়ে পড়বে।

কমলেশ সহজভাবে বললো, আমি আজ আপনাকে আরোও একটা কথা বলবো ভেবেছিলাম রাসমোহন বাবু—

বলুন, রাসমোহন বাবু হেসে বললেন, সঙ্কোচ করছেন কেন?

কমলেশ একটু ইতস্তত করে অবশেষে বললো, আমার মনে হয় শীলাকে দেখলে আপনার অপছন্দ হবেনা—

কথা শুনে রাসমোহন বাবু হঠাৎ বেশ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। ফাইলটা সামনে টেনে নিয়ে অকারণে দু'একটা পাতা ওল্টালেন। তারপর থেমে থেমে বলতে লাগলেন, পছন্দ কিংবা অপছন্দ করবার কথা নয় কমলেশ বাবু, আমি জানি আপনার মেয়ে সবদিক থেকেই ভাল হবে—

আর ওরা দু'জনে যখন দু'জনকে জানে—

সেটাও আমার কাছে খুব বড়ো কথা নয়, দু'মিনিট চুপ করে থেকে রাসমোহন বাবু বললেন, দেখুন আমি ব্যবসা করি বটে কিন্তু আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। একটি ছেলে আমার, যা কিছু সঞ্চয় সব ওরই জন্যে—

কিছু বুঝতে না পেরে কমলেশ শুধু বললো তা'তো বটে।

তাই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা আমার চাই। জানেনতো ওকে বিলেত পাঠাচ্ছি—

জানি। কিন্তু—কমলেশ হঠাৎ ঠিক করতে পারলো না একথার পর কী বলবে।

কমলেশ যাই বলুক না কেন, তার মেয়ের সংগে বিকাশের বিয়ে দেবার সামান্য ইচ্ছে রাসমোহন বাবুর নেই। আসলে সামাজিক পদমর্যাদার মোহে তিনি অন্ধ। এমন লোকের মেয়ের সংগে তিনি ছেলের বিয়ে দিতে চান যার সাহায্যে তাঁর ব্যবসার আরও উন্নতি হবে, পাঁচজনের কাছে গর্বের সংগে তিনি পরিচয় দিতে পারবেন। কমলেশকে আজ যতোখানি সম্মান করবার ভান তিনি করুননা কেন, একজন সাহিত্যিকের মূল্য তাঁর কাছে খুব বেশি নয়। বিকাশের মুখ থেকে যদি কমলেশের কথা তিনি যদি না

শুনতেন তাহ'লে হয়তো কোনদিন তার নাম কানে আসতো না। নেহাৎ আজ কমলেশ বিয়ের কথা তুলেছে, তাই লৌকিকতা বজায় রাখবার জন্তে তিনি পাঁচ হাজার টাকার কথা তুললেন। কিন্তু কমলেশ এই মুহূর্তে রাজি হ'য়ে গেলে তিনি অন্য অজুহাতে পিছিয়ে যাবেন।

কমলেশ আস্তে আস্তে বললো, অতো টাকা তো আমার নেই রাস-মোহন বাবু—

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে রাসমোহন বাবু হেসে বললেন, ওসব বৈষয়িক কথা আজ থাক কমলেশ বাবু। আমি বিকাশের সংগে কথা ব'লে পরে যাহয় আপনাকে জানাবো। ছেলে বড়ো হয়েছে, তারও তো একটা মতামত আছে—

ঠিক ঠিক, কমলেশ হঠাৎ যেন আশার আলো দেখতে পেলো। বিকাশকে সে খুব ভালো ক'রেই জানে। তবু রাসমোহন বাবু যে এতো স্পষ্ট ভাষায় তার কাছ থেকে টাকা দাবী করতে পারেন সেকথা সে এ বাড়িতে আসবার আগে ভাবতে পারেনি।

কমলেশ চলে যাবার পর রাসমোহন বাবু বিকাশকে শুধু মুল্যবান উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে শীলাকে বিয়ে করবার কথা সে যেন আর না ভাবে। যে জীবনে নিজের পায়ে ভর করে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়, সে একেবারে প্রথম থেকেই সতর্ক হয়ে চলে। কথা বার্তায় তিনি বুঝেছেন যে কমলেশের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তাছাড়া একজন লেখকের সংগে আত্মীয়তার সৃষ্টি করে বিকাশের কোনো উপকার হবে না। সে শিগগিরই উচ্চ শিক্ষার জন্মে বিলেত যাবে, তাই নানা ভাবে তার সামাজিক

প্রতিষ্ঠা দরকার। লেখককে তিনি নিজেও অবশ্য মনে মনে খুব বেশি সম্মান করেন। কিন্তু ওরা দূর থেকেই ভালো, ওদের কাছে গিয়ে কোনো লাভ হয় না।

বাবার মুখ থেকে এসব কথা শুনে বিকাশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। সে জানে না কমলেশের সংগে তাঁর কী কথা হয়েছে। আর এসব কথা আজ উঠলোই বা কেন। বাবাকে স্পষ্ট প্রশ্ন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে ভাবছিলো কখন কমলেশের কাছে গিয়ে সব কথা জেনে নেবে। কাজেই, রাসমোহন বাবু বিকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, আমি ভাবছি আর বেশি মেয়ে দেখবার দরকার নেই, আমাদের পার্টনার গৌরীশঙ্কর বাবুর মেয়ের সংগে তোমার বিয়ের কথা পাকাপাকি ক'রে ফেলি? সময় তো আর একেবারেই নেই, তোমাকে এবার যাবার জন্যে তৈরী হ'তে হবে?

বাবার মুখের ওপর কোনোদিনও বিকাশ কথা বলতে পারে না। আজ কিন্তু একটুও ইতস্তত না ক'রে সে বললো, এখন থাক বাবা, আমি বিলেত থেকে ফিরে বিয়ে করবো।

বিকাশের কথা শুনে রাসমোহন বাবু অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হয় না বিকাশ। শুধু তোমার কথা ভাবলে চলবে না, আমার দিকটাও দেখতে হবে তো। তুমি চলে গেলে আমি কা'কে নিয়ে থাকবো ব'লতে পারো?

আবার কথা বললো বিকাশ; আমার এখন বিলেত যাবার কী দরকার বাবা? আমি না হয় সেখানে না-ই গেলাম?

বিকাশ, রাসমোহন বাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, ছেলেমানুষী ক'রে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রো না। জানো না তোমার ওপর আমি কতোখানি নির্ভর করি?

বিকাশ সবই জানে। অন্তত এতোদিন বিশ্বাস ছিলো যে মায়ের মৃত্যুর পর তার চেয়ে বড়ো রাসমোহন বাবুর কাছে আর কেউ নয়—আর কিছু নয়। কিন্তু আজ মাত্র কয়েকটি কথায় তার সে ধারণা ভেঙে গেল। শুধু এই ভেবে বিকাশের দুঃখ হ'লো যে তার বাবার ব্যবসায়ী মন আজ সব কিছু আচ্ছন্ন ক'রে আছে।

তবু বিকাশ মনে মনে ঠিক ক'রে নিলো সে কী করবে। যথাসময়ে বাবাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবে বিলেত যাবার আগে সে কিছুতেই শীলাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। তিনি যদি অন্য কাউকে বিয়ে করবার জন্যে জোর করেন তা'হলে সে বিলেত যাবেনা। রাসমোহন বাবুর কথার অবাধ্য সে কখনও হয়নি। কারণ সে ভেবেছিলো তিনি তার জন্যে সব ছাড়তে পারেন। আজ বিকাশ স্পষ্ট বুঝতে পারলো তিনি তা পারেন না। তাই সেও তার বাবার জন্যে জীবনের এতো বড়ো সত্যকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না। সেঠিক করলো আজই বিকেলে সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে কমলেশের সংগে স্পষ্ট ক'রে সব কথা খুলে বলবে শীলাকেও।

এতোদিন পর আবার হঠাৎ বিকাশের মা'র কথা মনে পড়ে গেল।

রাসমোহন বাবু বিকাশকে মোটেই আঘাত দিতে চান না। শুধু বুঝিয়ে দিতে চান এমন ভুল তার কোনো মতেই করা উচিত নয়। এখন তার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—তাকে শুধু চেষ্টা করতে হবে জীবনে কেমন ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। রাসমোহন বাবুর অবর্তমানে তার যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

বিকাশ বুঝেছিলো কমলেশের সংগে রাসমোহন বাবুর তার সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়েছে আর যাবার সময় কমলেশের মুখ দেখে সে ধ'রে নিয়েছিলো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। সব কথা জানবার জন্যে সে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছিলো।

রাসমোহন বাবু নিজেই কথা তুললেন, কমলেশ বাবু ওঁর মেয়ের সংগে তোমার বিয়ের কথা বলছিলেন, কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে তিনি আবার বললেন, আমি মোটে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিলাম। তা' দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

বিকাশ রাসমোহন বাবুর কথা শেষ হবার সংগে সংগে বললো, কমলেশ বাবুর কাছে টাকা সব চেয়ে বড়ো নয় বাবা। তাই হাজার অভাবের মধ্যে থাকলেও টাকার কথা ভাববার সময় তিনি পান না।

আমি জানি—

রাসমোহন বাবুর মুখ গম্ভীর হ'লো। তিনি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। এসব কথার উত্তরে ছেলেকে তাঁর অনেক কথা বলবার ইচ্ছে হ'লো। তিনি বলতে চাইলেন, ইচ্ছে করলেই লোকের টাকা হয় না। মাত্র পাঁচ হাজার টাকার অভাবে এমন সুপাত্র ছেড়ে যাকে পেছিয়ে যেতে হয় তার জীবনে সার্থকতা কোথায়!

কিন্তু এমন কোনো কথা ইচ্ছে ক'রেই রাসমোহন বাবু বিকাশকে বললেন না। ছেলের সংগে তিনি তর্ক করতে চান না। তাঁর ভয় হ'লো পাছে সে তাঁকে স্বার্থপর বলে মনে করে। কাজেই একটু ঘুরিয়ে কৌশলে কথা বলতে হবে। বিকাশের যেন কখনও মনে না হয় তিনি কমলেশকে ছোটো ক'রে দেখেন। ছেলের এখন এমন মনের অবস্থা যে রাসমোহন বাবু সহজেই বুঝতে পেরেছেন কোনো যুক্তি তর্কের কথা সে মানবে না।

তুমি আমার কথা ভুল বুঝো না বিকাশ, রাসমোহন বাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, আমার কাছেও টাকা তোমার চেয়ে বড়ো নয়—কিন্তু টাকা ছাড়া যখন আমরা এক পা'ও চলতে পারি না তখন বাধ্য হয়ে আমাদের সব চেয়ে আগে সে কথা ভাবতে হয়—

সকলে তা' ভাবতে পারে না বাবা।

রাসমোহন বাবু হেসে বললেন, ভাবতে হয়। সোজাভাবে না ভাবতে পারলেও অন্য রকম ক'রে ভাবে। এই ধরো না কেন, মনে মনে ভাষা সাজিয়ে নিয়ে হাসিমুখে তিনি বললেন, তুমি যদি আমার ছেলে না হ'তে তাহ'লে কিছুতেই তিনি তোমার সংগে তাঁর মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে পারতেন না।

বিকাশ বললো, কমলেশ বাবুকে তুমি জানোনা বাবা, তাই একথা বলছো—

না জানিনা। তা'তে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি শুধু এইটুকু জানি যে পিতা সন্তানের মংগল চায়। দরিদ্র বেকারের সংগে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয়না। তুমি ভেবে দেখ, আমি নেই, আমার এ সম্পত্তি নেই। সমাজে তাহ'লে কী মূল্য তোমার?

বিকাশ আর কথা বললো না। তার বাবার স্বভাব সে জানে। এসব নিয়ে বেশি কথা ব'লে কোনো ফল হবে না। তাই সে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো।

রাসমোহন বাবু বিকাশকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে মনে মনে ভরসা পেয়ে বললেন, তোমার বিলেত যাবার সময় হ'য়ে এলো, যা' করবার এখুনি পাকাপাকি ক'রে ফেলতে হয়।

বাধা দিয়ে বিকাশ আবার বললো, আমি এখন বিয়ে করবো না বাবা। বিলেত থেকে ফিরে যখন চাকরি করবো তখন—

তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, যা' ভালো বোঝো নিশ্চয়ই তা' করবে। তবে তোমার মা নেই। তোমার ভালো মন্দ ভেবে আমার ঘুম হয় না। তাই আমি যা' বলি তোমার ভালোর জন্যই! তুমি চ'লে গেলে আমার পক্ষে এ বাড়িতে একা থাকা কতোখানি কষ্টকর সেকথা বোধহয় তুমি বুঝতে পারবে না বিকাশ, রাসমোহন বাবু তাকে একা থাকবার অবসর দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে গেলেন।

রাসমোহন বাবু যাই বলুননা কেন, বিকাশ ঠিক ক'রে নিয়েছে সে কী করবে। শীলাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবার কথা সে ভাবতে পারেনা। আজ কমলেশকে সেকথা জানিয়ে দেবে। আর শীলাকে বলবে তার জন্যে মাত্র দু'টি বছর অপেক্ষা করতে।

হঠাৎ বিকাশের মনে যেন প্রচণ্ড সাহস এসে গেছে। বাবার সংগে সহজ স্বরে এতো কথা সে বলতে পারলো কেমন ক'রে? সে স্থির করলো কমলেশ আর শীলার সংগে ঠিক এমনি করেই কথা বলবে।

রাসমোহন বাবুর সংগে কথা বলে ভারী মন নিয়ে কমলেশ বাড়ি ফিরে এলো। সে ভাবেনি তাঁর কাছ থেকে এমন কথা শুনতে হবে। টাকার অভাব কী তাঁর? অভাব থাক বা না থাক রাসমোহন বাবুর মতো লোক কেমন ক'রে অমন স্পষ্ট ভাষায় টাকার দাবী করতে পারলেন। কমলেশ হঠাৎ নিজেকে বড়ো দুর্বল মনে করলো। তার চোখের সামনে থেকে সব আলো যেন মুছে যাচ্ছে। আজ আবার নতুন ক'রে তার মনে হ'লো সে লেখক না হ'য়ে অন্য কিছু হ'লে অনেক বেশি শান্তি পেতে পারতো। অসহায়ের মতো কমলেশ সুলতার কাছে এসে দাঁড়ালো।

কমলেশের এমন অসহায় রূপ সুলতার অজানা নয়। যখন সে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেনা কিংবা যেখান থেকে টাকা পাবার কথা ছিলো সেখান থেকে পায়না তখন এমন করুণ মুখে সুলতার পাশে এসে দাঁড়ায়।

সুলতার কাছে এমনি ক'রে দাঁড়ানো কমলেশের অভ্যাস। সে জানে আজকাল সুলতা তাকে আশ্বাস দেয় না—কোনো মূল্যও হয়তো দেয় না। কিন্তু তবু আগে সে তাকে সান্ত্বনা দিতো, আশার কথা বলতো ব'লে আজও কমলেশ বাইরে থেকে আঘাত পেলে তেমনি নীরবে তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

কী বলবে ? সুলতা জিজ্ঞেস করলো, শীলার কলেজের খরচ যোগাড় করতে পারলে না সে কথা বলতে এসেছো তো ?

না, কমলেশ যেমনি নিঃশব্দে এসেছিলো আবার ঠিক তেমনি ক'রে নিজের লেখবার টেবিলে এসে বসলো। কোনো কথা বলা হ'লো না তার সুলতাকে। না, তার কেউ নেই। সকলকে যদি সে একে একে না ছাড়তে পারে তাহ'লে তাকে লেখা ছেড়ে আর পাঁচজন সংসারী লোকের মতো হ'য়ে উঠতে হবে। এখনও হয়তো সময় আছে। কী করবে কমলেশ ?

কমলেশ চ'লে যেতে সুলতা যেন বেশ লজ্জা পেলো। স্বামীকে সে অশ্রদ্ধা করতে চায় না কিন্তু মাঝে মাঝে কঠিন হ'য়ে শুধু বুঝিয়ে দিতে চায় আর পাঁচজনকে নিয়ে ঘর করতে হ'লে তাদের কথাও ভাবতে হয়। অভাব মানুষের সব কিছুই আস্তে আস্তে নষ্ট ক'রে দেয়। দৈনন্দিন অভাবের জন্যেই সুলতার আজ এই পরিবর্তন। নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে কমলেশের ঘরে চ'লে এলো। স্বামীর কথা ভেবে হঠাৎ মায়া হ'লো তার।

কী বলবে বল ? মৃদু স্বরে সুলতা স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো।

কমলেশ কোনা দ্বিধা না ক'রে বললো, বিকাশের সংগে শীলার বিয়ের কথা রাসমোহন বাবুকে জানিয়েছিলাম। উনি পাঁচ হাজার টাকা চান। অতো টাকা আমি কোথায় পাই বল তো ?

কেন তুমি ছেলেমানুষের মতো এসব কথা তাঁকে এখন বলতে গেলে? এ সামান্য বুদ্ধি কি তোমার নেই যে অমন ছেলের জন্যে আশ্চর্য রকম বেশি টাকা তিনি চাইবেন? সকলেই টাকা বাড়াতে চায়। তোমার মতো মন নিয়ে কারোর চলে না।

কিন্তু বিকাশ একেবারে অন্য রকম সুলতা, সেকথা আমি খুব ভালো ক'রে জানি।

বিকাশ কেমন তা জেনে আমাদের কোনো লাভ নেই। বাবার মতের বিরুদ্ধে কিছু করবার ক্ষমতা নেই তার। আর সে কেন শুধু শুধু বাবার আবাধ্য হবে? রাসমোহন বাবু অমন ছেলের জন্যে অন্যায় দাবী করেন নি। পাঁচ হাজার টাকা খুবই কম। তোমাকে আগেই বারণ ক'রেছিলাম এসব ব্যাপার নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে যেওনা। দেখলে তো কোনো ফল হ'লো না, শুধু শুধু আমাদের দৈন্য অন্য লোককে গায়ে প'ড়ে জানানো হ'লো—

কমলেশ সুলতাকে কী বলতে গিয়ে দেখলো সে আর সে-ঘরে নেই।

সেদিন বিকাশ কমলেশের সংগে দেখা করতে পারে নি। নানা কারণে তার মনের অবস্থা ভালো ছিলো না। বাবার সংগে তার বিয়ের ব্যাপারের জের আরও দু'একদিন ধ'রে চ'লেছিলো। রাসমোহন বাবুর ব্যবসায়ী বন্ধুর মেয়ের সংগে বিকাশের বিয়ে তিনি এক রকম ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন। কিন্তু কেমন ক'রে বিকাশ নিজেই বুঝতে পারে না—

রাসমোহন বাবুর মুখের ওপর সে স্পষ্ট জানিয়ে দিলো বিলেত যাবার আগে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। দু'বছর পর সেখান থেকে ফিরে যা হয় করবে। আর সেইদিন সন্ধ্যে বেলা শীলার সংগে এ সম্বন্ধে কথা বলতে এলো।

বিকাশ কিছু বলবার আগেই কমলেশ বুঝতে পেরেছিলো একেবারে চুপ ক'রে থাকবার ছেলে সে নয়। টাকা তার কাছে শীলার চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠবেনা সে বিশ্বাস তার ছিলো। তাই বিকাশের সামনে সুলতাকে ডেকে সে জানিয়ে দিলো বিকাশ আজ কী কথা বলতে এসেছে তাদের।

এইবার শীলার সংগে কথা বলবার পালা। প্রত্যেকের সংগে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছে বিকাশ। সে নিজে অবাক হ'য়ে ভাবছিলো সব সঙ্কোচ কেমন ক'রে সে বিসর্জন দিতে পারলো। তাই বোধ হয় শীলার সংগে কথা বলতে হবে মনে ক'রে রাজ্যের লজ্জা এসে তাকে যেন হঠাৎ ঘিরে ফেললো। রাসমোহন বাবুর কথা শুনে সে কী মনে করেছে? পৃথিবীর আর সব লোক ছোটো মনে করলে কিছু যায় আসেনা বিকাশের, কিন্তু শীলা তাকে যেন কোনদিনও ভুল না বোঝে—তাকে স্বার্থপর মনে ক'রে কখনও না দূরে স'রে যায়।

সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। তখনও ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। কমলেশের সংগে কথা শেষ ক'রে বিকাশ পাশের ছোটো বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সুলতা আবার রান্না ঘরে ফিরে গেছে। ঠিক বুঝতে পারলো না বিকাশ শীলা সেই বারান্দায় তার অপেক্ষায় ব'সে আছে কি না।

তোমার সংগে কথা বলতে এলাম শীলা, তার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিকাশ বললো, আবার দু'বছর পর ফিরে আসবো—আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি, এ দু'বছর তোমাকে আমার জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে—

ম্লান হেসে শীলা বললো, তখনও যদি বাবা পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করতে না পারেন?

শীলা! আহত স্বরে বিকাশ বললো, তুমি জানো না আমি নিজে কতো বিচলিত হয়েছি—ওকথা তুলে তুমি আর আমাকে আঘাত দিওনা!

তুমি সত্যি চলে যাবে?

আমাকে যেতে হবেই। তা'না'হলে ভালো চাকরি পাওয়া কঠিন। তুমি শুধু আমাকে কথা দাও যে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে—আমি যেমন করে সব বাধা জয় করলাম, প্রয়োজন হ'লে তুমিও ঠিক তাই করবে?

শীলা জিজ্ঞাসা করলো, মা বাবাকে বলেছো?

হ্যাঁ। তাঁরা কথা দিয়েছেন। এখন আমি শুধু তোমার মুখ থেকে তোমার কথা শুনতে চাই?

চোখ তুলে নিঃশব্দে সেই অন্ধকারে শীলা শুধু বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কী কথা বলবার জন্যে তার ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠলো। কিন্তু একটী কথাও সে বলতে পারলো না।

চার

শেষ অবধি শীলার কলেজে ভর্তি হওয়া হ'লো না। সুলতা জানতো এমন হবে তাই সে একটি কথাও বললো না। কমলেশ আশা দিয়েছিলো, ও ভর্তি হ'য়ে যাক্, আমি যেমন ক'রে পারি চালিয়ে দেবো। কিন্তু সুলতা তার কথা শোনে নি। গম্ভীর মুখে শুধু বলেছিলো, দরকার নেই, বিকাশ ফিরে না আসা পর্যন্ত শীলা ঘরের কাজে আমাকে সাহায্য করুক।

ওদিকে বিকাশ বিলেত চ'লে গেছে। যাবার আগে বেশ জোর দিয়ে সকলের সামনে ব'লে গেছে, আমি যেমন বাবার অবাধ্য হ'য়ে বিয়ে না ক'রে চ'লে যাচ্ছি, ফিরে এসে ঠিক তেমনি ক'রে বিয়ে করবো। মোটে দু'বছর—দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

বিকাশ চ'লে যাবার পর সব চেয়ে বেশি অসুবিধা হ'লো শীলার। কলেজে ভর্তি হ'তে পারলে হয়তো তার এতো খারাপ লাগতো না। এখন এতো বেশি নিঃসঙ্গ মনে হয় যে মাঝে মাঝে তার এখানে ওখানে ছুটে চ'লে যেতে ইচ্ছে করে। এমনি ক'রে ঘরে ব'সে সে কিছুতেই দু'বছর কাটাতে পারবে না। তাকে একটা কিছু করতে হবেই।

যখন বিকাশ ছিলো, তখন তার এতো খারাপ লাগতো না। তার সংগে দেশ বিদেশের গল্প ক'রে আর মনের কথা ব'লে তার সব নির্জনতা যেন ঘুচে যেতো—সংসারের এই দারিদ্র্য তার মনে এতোটুকু রেখাপাত করতো না। হঠাৎ তার চারপাশে কে যেন একটা গণ্ডি টেনে দিয়েছে, যা' পেরিয়ে সে যেতে পারে না। কিন্তু এই গণ্ডির মধ্যে সারা দিন রাত শীলা থাকতে পারবে না! তাকে অন্য কিছু করতে হবে।

ওদিকে কমলেশও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। লিখতে লিখতে খোলা জানালা দিয়ে সে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে কী যেন ভাবে। তার মনে হয় কবে সংসারের এই দারিদ্র্য ঘুচে যাবে, কবে তার পরিশ্রম সার্থক হবে। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করে সে। তার কলমের গতি আজকাল নানা ভাবনায় রীতিমতো শ্লথ হ'য়ে গেছে। সে ঠিক করলো কিছুদিন বিশ্রাম করবে। লেখা যখন 'আর হ'য়ে উঠছে না তখন অন্তত সুলতা আর শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য কোনো কাজ করবে কমলেশ। দেখা যাক তা' করলে সংসারের অভাব ঘুচে যায় কি না।

এক সময় কমলেশ সুলতাকে বললো, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, তাই আমি ঠিক করেছি একটা চাকরি করবো—

সুলতা ম্লান হাসলো, তোমার এ সুবুদ্ধি আগে হ'লে হয়তো কাজ হ'তো। চাকরি পাওয়া কি অতোই সোজা?

চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কী, কথা বলতে বলতে কমলেশ একটা সিগ্রেট ধরালো। এতো বিচলিত সে জীবনে কোনোদিন হয় নি। ব্যর্থতার গ্লানিতে তার সমস্ত মন যেন ভ'রে যাচ্ছে।

সুলতা জিজ্ঞেস করলো, এতোদিন পর চাকরি করবার ইচ্ছে হ'লো যে হঠাৎ?

এক কথায় কমলেশ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না। ইচ্ছে তার অকারণে হয় নি। তার সারা মন ভ'রে হঠাৎ যেন আগুন ধ'রে গেছে। অথচ কমলেশ জানে না কার জন্যে তার এ বিদ্রোহ।

বিকাশের বাবাকে সে অবশ্য খুব বেশি দোষ দিতে পারে না। তিনি শুধু সমাজের রীতি নীতি মেনে চলছেন—এতে কার কী বলবার আছে। রাসমোহনবাবুর ওপর রেগে যাওয়া কিংবা তাকে ছোটো মনে ক'রে অবহেলা করা হয়তো মূর্খের কাজ।

কিন্তু শীলার কথা মনে করে কমলেশ যেন নিজের কাছে নিজে ছোট হ'য়ে গেছে। একটি মাত্র মেয়ে তার। তাকে ভালো ভাবে মানুষ করবার ক্ষমতা কমলেশের নেই। এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কী থাকতে পারে। সে বরাবর লক্ষ্য করেছে যখন তার অর্থের প্রয়োজন ঠিক সেই মুহূর্তে তার কলম থেমে যায়, আর প্রকাশকরাও বিশেষ উৎসাহ দেখায় না। আর পাঁচজন নতুন লেখকের কথা উল্লেখ ক'রে বলে, ওদের মতো বই লিখুন একটা, টাকা তাহলে উপচে পড়বে আপনার।

সেই সব লেখকের মতো লেখা যদি কমলেশ লিখতে পারতো তাহলে আজ যৌবনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে সংসারের কথা ভেবে তাকে চাকরি করবার কথা ভাবতে হ'তো না। মানুষের রুচিকে নিয়ে খেলা করতে চায় না কমলেশ, নিজের গভীর উপলব্ধি শুধু তার সম্বল।

সুলতার কথার উত্তরে অনেকক্ষণ পর কমলেশ বললো, লিখে তো তোমার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না—

আমার জন্যে এ বয়সে তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, একটু উষ্ণস্বরে সুলতা বললো, আমি তোমার কাজের কোনো ক্ষতি কখনও করতে চাইনি—

আমি জানি সুলতা, তাই তোমাকে আমি দোষ দিই না।

তা হ'লে কেন বল আমার জন্যে এ বয়সে তুমি চাকরি করবে, কমলেশকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে সুলতা বললো, অন্ধ তো নও তুমি, দেখতে পাও না সংসারের কী অবস্থা হয়েছে? শীত এসে গেল বাড়িতে গরম কিছু নেই বললেই চলে—

সব দেখতে পাই, কমলেশ আস্তে আস্তে বললো, সবই বুঝি। দেখি এবার কী করতে পারি, সুলতার সংগে কথা শেষ ক'রে সে বাইরে বেরোতে যাবে এমন সময় শীলা ডাকলো, বাবা?

কি রে, কমলেশ ফিরে দাঁড়ালো, কী বলছিস ?

শীলা বাবার পাশে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। মা বাবার কথা সে সব শুনেছে। আর শুনতে শুনতে নতুন কথা মনে হয়েছে তার। কমলেশের এখন চাকরি করবার কী দরকার ? শীলার যথেষ্ট বয়স হয়েছে লেখাপড়াও সে কিছু শিখেছে। আর দু'বছর যখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে তখন শুধু শুধু বাড়িতে চুপ করে ব'সে থেকে কী লাভ ? সে জানে আজকাল অনেক মেয়ে আপিসে চাকরি করে। তার কতো বন্ধু বান্ধব, যারা টাকার জন্যে আর পড়াশুনো করতে পারলো না, তারা সকলেই ঢুকে পড়েছে। তাই মা বাবার কথা শুনতে শুনতে শীলার মনে হ'লো সে-ই বা চাকরি করবে না কেন ? তাহ'লে হয় তো সে আরও অনেক ভালো থাকবে—বিকাশকেও ভুলে থাকবে। তার কাছ থেকে বাইরের নানা খবর শুনে শীলা এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে দেশের যা' অবস্থা হয়েছে, এখন একজনের উপার্জনে সংসার চালানো কঠিন। তার ওপর এই বয়সে বাবাকে চাকরি করতে দিলে তার ওপর অবিচার করা হবে—অন্যায় করা হবে। আর হয়তো তাহ'লে সে আর কোনোদিনও কিছু লিখতে পারবে না। তার বাবার জন্যে সে বিকাশের মতো ছেলেকে পেয়েছে, তাই নিজের স্বার্থপরতার জন্যে, সংসারের অভাবের জন্যে আজ যদি কমলেশকে তারা চাকরি করতে দেয় তাহ'লে শীলার মনে হ'লো, নিজেকে অলস অকর্মণ্য ব'লে প্রমাণ করা হবে।

কী বল্‌বি বল ! কমলেশ আবার জিজ্ঞেস করলো।

কোথায় যাচ্ছো ?

একটু দরকারে যাচ্ছি মা, আমার বন্ধুর আপিসে।

স্তিমিত স্বরে শীলা বললো, না। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। শীলার কথা শুনে কমলেশ অবাক হ'লো। এমন ক'রে সে কখনও তার

সংগে কথা বলে নি। মেয়ের কী হয়েছে আর সে কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে কমলেশ তার খুব কাছে স'রে এসে জিজ্ঞেস করল, কী বলবি? আমার সংগে কিছু কথা আছে তোর?

মাথা নিচু ক'রে শীলা বললো, হ্যাঁ।

কী কথা বল?

শীলা ইতস্তত করতে লাগলো। তারপর কোনো সঙ্কোচ না ক'রে মাথা তুলে কমলেশকে বললো, তুমি চাকরি ক'রো না বাবা, তাহ'লে তোমার লেখার ক্ষতি হবে।

কমলেশ কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। ভুল কথা বলে সুলতা। শীলার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ ক'রে সে বৃথাই তাকে দোষ দেয়। মেয়ের কথা শুনে কমলেশের বুক ভ'রে উঠলো।

শীলার কথা শুনে সে বললো, এখন আর লিখতে ইচ্ছে করে না শীলা, জোর ক'রে ভালো লেখা যায় না। তাই ভাবছি চুপ ক'রে ব'সে না থেকে কিছুদিনের জন্যে একটা চাকরি করবো—

না বাবা, একটু থেমে শীলা বললো, তোমার চাকরি করা এখন ভালো দেখায় না—

কমলেশ হেসে বললো, আমি ভালো মন্দের কথা ভাবছি না শীলা, আমি শুধু তোদের কথা ভাবছি—সংসারের কথা ভাবছি—

তুমি একা শুধু সংসারের কথা ভাববে কেন?

তাহ'লে আর কে ভাববে রে পাগলী?

কেন, আমি ভাবতে পারি না?

খুব জোরে হেসে কমলেশ বললো, বেশ তো। কে ভাবতে বারণ করেছে তোকে? ভেবে ভেবে মা'কে সাহায্য কর্—

আমি চাকরি করবো বাবা, তোমরা অমত ক'রো না।

সে কী রে! কমলেশ হেসে বললো, তুই চাকরি করবি কেন?

কেনই বা করবো না? এখন ছ'বছর ঘরে ব'সে থেকে আমার তো আর কিছু করবার নেই।

তা হয় না শীলা, কমলেশ গম্ভীর হ'য়ে বললো, এসব আজে বাজে কথা ভেবে মাথা ঘামাস না। তোর মতো এতো কম বয়সে কোনো মেয়ে চাকরি করে না রে—

শীলা বাধা দিয়ে বললো, হ্যাঁ বাবা করে। আমার বন্ধু জয়শ্রী আমার সংগে পড়তো। সে পাশ ক'রেই চাকরিতে ঢুকে পড়লো। এখন প্রায় একশো টাকা মাইনে পায়—

জয়শ্রী কে?

তুমি তাকে দেখনি। সে এ বাড়িতে কখনও আসে নি। ওর বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন। অনেক ছোটো ছোটো ভাই ওর—

কিন্তু শীলা, কমলেশ মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে বললো, তোর বাবা মারা যায় নি, আর তোর ছোটো ছোটো ভাইও নেই—তুই চাকরি ক'রে শুধু শুধু শরীর খারাপ করবি কেন?

দৃঢ়স্বরে শীলা বললো, শরীর খারাপ হবে না বাবা, বরং ভালো হবে, সারাদিন বাড়ি ব'সে থাকতে আমার ভালো লাগে না।

শীলার কথা শুনে প্রথমে সুলতা অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। ওইটুকু মেয়েও আর বাপের ওপর নির্ভর করতে ভরসা পায় না—বাইরে বেরিয়ে চাকরি করতে চায়। অবাক হ'লেও শীলার কথা শুনতে শুনতে সুলতা যেন আশার আলো দেখতে পেলো। সত্যিই তো এখন সারাদিন বাড়ি ব'সে কী করবে শীলা! সংসারে তার কী কাজ! আর যখন তার বিয়ের ভাবনাও ভাববার দরকার নেই তখন অন্তত ছ' বছরের জন্যে সে একটা

চাকরি করে তাহ'লে সুলতা খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। ছোটো খাটো পাওনাদারের তাগাদা সে আর সহ্য করতে পারছে না। লজ্জায় তাদের কাছে মাথা কাটা যায় সুলতার। মাঝে মাঝে আজকাল এমন অবস্থা হয় যে বাজার করবার জন্যে একটি টাকাও থাকে না তার কাছে।

শীলা আর কমলেশের কথার মাঝে হঠাৎ সুলতা বললো, শীলা চাকরি করুক। তুমি কেন বাধা দিচ্ছো? ওর কিছু ক্ষতি হবে না চাকরি করলে—

কিন্তু, কমলেশ বললো, আমি যদি চাকরি করি তাহ'লে শীলার শুধু শুধু কষ্ট করবার কী দরকার!

কমলেশ যে চাকরি পাবে আর সে মাসে মাসে থোক টাকা সুলতার হাতে দেবে সেকথা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। এখন তার কী কথা ভেবে হয়তো হঠাৎ চাকরি করবার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু সুলতা জানে একটু পরে ঘুরে এসে সে বলবে, চাকরি পাওয়া গেল না কিংবা নিজেকে প্রতারণা করবো কেমন ক'রে—এই ধরণের একটা কিছু।

তাই সুলতা বললো, ওর যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন চাকরি করুক, ওইটুকু মেয়ে সারাদিন বাড়ি ব'সে করবেই বা কী?

কমলেশ বললো কিন্তু কী চাকরি করবি তুই?

আজকাল মেয়েরা খুব চাকরি পায় বাবা, শীলা বললো, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, আমি জয়শ্রীর সংগে কথা ব'লে সব ব্যবস্থা ক'রে নেবো।

কমলেশের আর বেরোনো হ'লো না। ফিরে এসে সে লেখার টেবিলে বসলো। হাতের কাছে ছিলো বিকাশের কবিতার বই 'সম্রাজ্ঞী'। কমলেশ তাই টেনে নিয়ে আবার নতুন ক'রে পড়তে লাগলো।

বিকাশ এর মধ্যে তা'কে দু'টো চিঠি লিখেছে। একটা জাহাজ থেকে আর একটা বিলেতে পৌঁছে। সে বেশ ভালোই আছে এখন। দেশ ছেড়ে আসবার সময় তার খুব মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন

নতুনের মাঝে প্রাণপণে সে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। তবু কমলেশের কথা মনে ক'রে তার খুব মন খারাপ হ'য়ে যায়। কতোদিন তার সংগে সে আর নানা আলোচনা করতে পারবে না কে জানে। সেখানে কয়েক জন তরুণ কবির সংগে বিকাশের আলাপ হয়েছে। তাদের দু' একটি বই শিগগিরই সে কমলেশকে পাঠিয়ে দেবে।

পরদিন বিকেলবেলা শীলা জয়শ্রীদের বাড়ি এসে হাজির হ'লো। এক কালে ওরা দুজন খুব বন্ধু ছিলো। এখন নানা কারণে আর খুব বেশি দেখাশুনো করা সম্ভব হয়না। শীলা আবার জয়শ্রীর বাড়ি এলো প্রায় এক বছর পরে।

খুব ছোট দু'খানি ঘর জয়শ্রীদের। শীলা জানে তার বাবা কিছুই রেখে যেতে পারেননি। এখন জয়শ্রীর সামান্য মাইনেতেই সংসার চলে।

শীলাকে ঢুকতে দেখে জয়শ্রীর মা বললেন কতো বড়ো হ'য়ে গেছ, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি শীলা। এসো এসো—অনেকদিন পর তুমি এলে। কেমন আছো ?

ভালো আছি মাসিমা, জয়শ্রী আসেনি এখনো ?

না, আজকাল নাকি তার আপিসে কাজ বেড়েছে। বাড়ি আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে যায়।

ঠিক আছে, শীলা বললো, আমি মাকে ব'লে এসেছি। জয়শ্রীর সংগে আমার একটু দরকার আছে মাসিমা।

বেশ তো, তুমি ব'সোনা যতোক্ষণ খুশি। কিন্তু শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে জয়শ্রীর মা বললেন, এ কী, জয়শ্রী বলছিলো তোমার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে—

না না মাসিমা, লজ্জা পেয়ে শীলা বললো ওর ওসব আজে বাজে কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না।

শীলা ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। বেচারী জয়শ্রী! সংসারের ভাবনা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা করবার আর অধিকার নেই তার—নিজের কথাও নয়। তার মাথার উপর এখন অনেক দায়িত্ব। ছোটো ছোটো অতোগুলি ভাইকে সে একা মানুষ করবে কেমন ক'রে।

জয়শ্রীদের ঘরের এপাশে ওপাশে তাকিয়ে দেখতে দেখতে শীলার হঠাৎ মনে হ'লো তারাতো সত্যি এদের চেয়ে অনেক ভালো আছে। তাহ'লে মা বার বার বাবার কাছে অভিযোগ জানায় কেন!

জয়শ্রীর মা একসময় এসে ঘরের আলো জেলে দিয়ে গেলেন। এই মাত্র সন্ধ্যে হ'লো। আসে পাশের বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠলো। এদের বাড়িতে সবে উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘর। শীলার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। ওদিকে জয়শ্রীর ছোট ভাইরা এক-সুরে কেঁদে উঠলো।

জয়শ্রীর মা বললেন, এখনো ও ফিরছেনা কেন বুঝতে পারছিনা, কী যে কাজ করে এতোক্ষণ ধরে—

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই জয়শ্রী এসে ঘরে ঢুকলো। শীলাকে দেখে সে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো, শীলা!

তাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শীলা বললো, তোর জন্যে সেই কখন থেকে ব'সে আছি। কোথায় থাকিস এতোক্ষণ?

কতো কাজ আমার এখন, শীলাকে হাত ধরে খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে

জয়শ্রী বললো, অনেকদিন তোর সংগে দেখা নেই। কেমন আছিস্ বল্? কিন্তু কই এখনো বিয়ে করিসনি যে? আমি তো ভেবেছিলাম এতোদিনে ছেলের মা—

আঃ—বাধা দিয়ে শীলা বললো কী যা-তা বকছিস? মাসিমা শুনতে পাবেন যে! আর ওঁকে কী সব বাজে কথা বলেছিস আমার নামে?

জয়শ্রী হেসে বললো, আমি ভাই সত্যি ভেবেছিলাম এতোদিনে তুই বিয়ে করে বসে আছিস—

আমার বিয়েতে তোর নেমতন্ন হবেনা সে কথা ভাবতে পারলি কেমন ক'রে?

কে জানে, আনন্দে গদ গদ হ'য়ে আমাদের কথা ভুলে যেতে পারিস তো?

দূর! অমন ভোলা মন আমার নয়।

যাক, তোর বিকাশের কী খবর বল?

সে তো এখন এখানে নেই, শীলা বললো, দু'বছরের জন্যে বিলেত চ'লে গেছে।

হায়রে বিরহিনী! তাই বুঝি আমার সংগে দেখা করবার সময় পেলি?

তোর কাছে আমার বিশেষ দরকার, সমস্ত কথা জয়শ্রীকে সংক্ষেপে ব'লে শীলা জানতে চাইলো তাদের আপিসে তার চাকরি পাবার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না।

তুই যখন বলছিস, জয়শ্রী থেমে থেমে বললো, তখন সম্ভাবনা না থাকলেও আমি তোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো।

কিছু করতে পারবি বলে মনে হয়?

দেখি তো, একটু ভেবে জয়শ্রী বললো, নীলিমাদিকে ভালো করে ধরতে পারলে মনে হয় তোর চাকরি হয়ে যাবে।

শীলা জিজ্ঞেস করলো, নীলিমাদি কে?

জয়শ্রী মুচকি হেসে বললো, আমার মতো কেরানী হয়ে ঢুকেছিলো কিন্তু এখন ওই হ'লো আমাদের আপিসের সব। মানে—বুঝলি কিনা, সেক্রেটারির সংগে ওর একটু—জয়শ্রী ইসারায় শীলাকে বাকি কথা বুঝিয়ে দিল।

যাঃ ভারী অসভ্য হ'য়েছিস তুই আজকাল—লোকের নামে শুধু যা-তা বলিস—

জয়শ্রী তেমনি ভংগি ক'রে বললো, ঢোকোনা একবার আমাদের আপিসে, চোখের সামনে নীলিমাদির কতো রংগ দেখতে পাবে তখন—

তা'না হয় দেখা যাবে, শীলা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এখন যেমন করে হয় আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও দেখি?

তুই কাল আয় আপিসে, আমি নীলিমাদি'কে বলে রাখবো।

বেশ এবার আমাকে একটু পৌছে দেবে, বাইরে বড়ো অন্ধকার হ'য়ে গেছে যে—

কচি খুকি, দাঁড়া আগে কিছু খেয়ে নি, জয়শ্রীর মা ততোক্ষণে দু'জনের জন্যে প্লেটে লুচি ভেজে এনেছেন।

ডালহৌসি স্কোয়ারে জয়শ্রীর মাড়োয়ারি সদাগরী আপিস। খুব বেশি বড়ো নয়, বছর কয়েক হ'লো এই আপিস খোলা হয়েছে। জয়শ্রীর কথা মতো ঠিক দুপুর দু'টোর সময় শীলা সেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো।

কাল সারারাত ধ'রে সে শুধু জয়শ্রীর কথা ভেবেছে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে কী প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন তার হ'য়েছে। কে জানে বাইরে বেরিয়ে

চাকরি করলে হয় তো শীলারও হবে।

জয়শ্রীর চাল চলন খুব সাধারণ ছিলো। জামা কাপড় নিয়ে কোনো দিন সে বেশি মাথা ঘামাতো না। কাল সন্ধ্যেবেলা শীলা তাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেছে। গালে আর ঠোঁটে প্রচুর রং মেখেছিলো জয়শ্রী। গা থেকে দামী বিলিতি এসেন্সের গন্ধ ভেসে আসছিলো। তা'ছাড়া ওর চেহারাও আর আগের মতো নেই। কতোই বা মাইনে পায় জয়শ্রী! কিন্তু অমন চালে থাকে কেমন ক'রে?

যাক, অতো কথা ভেবে ব্যস্ত হবার দরকার নেই শীলার। এখন ভালোয় ভালোয় তার এই আপিসে একটা চাকরি হ'লে হয়।

জয়শ্রীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সেই আপিসের চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎ শীলার গা ছমছম ক'রে উঠলো। যদি তার চাকরি না হয়? আর যদি হয় তাহ'লে করতে পারবে তো? যদি না পারে তাহ'লে তাকে এরা নিন্দে করবে—তার চাকরি চলে যাবে! তখন কেমন ক'রে মা বাবার কাছে সে মুখ দেখাবে।

নানা কথা ভেবে শীলা মনে সাহস আনবার চেষ্টা করলো। জয়শ্রী যদি চাকরি করতে পারে তাহ'লে সে কেন পারবে না? জয়শ্রীকে সে ছেলে বেলা থেকে জানে। অমন ভালোমানুষ মেয়ে তার জানা শোনার মধ্যে আর কেউ ছিলো না।

কাউকে কিছু বলতে পারে নি, কিন্তু কাল জয়শ্রীকে দেখবার পর থেকে সে শুধু তার কথাই ভেবেছে। কী সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়েছে জয়শ্রীর। শুধু কথায়-বার্তায় নয়—কাজে সজ্জায়ও। শীলা কোনো দিন ভাবতে পারে নি যে তার মতো মেয়ে এমনি নির্ভিক হ'য়ে উঠবে—এমনি করে আগাগোড়া বদলে যাবে।

এই যে এসেছিস, জয়শ্রী শীলার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, আমি

নীলিমাদি'কে তোর কথা ব'লে রেখেছি, কিছু ভাবনা করিস না, মনে হচ্ছে তোর চাকরি হ'য়ে যাবে—

শীলা আস্তে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু কবে থেকে?

একটু দাঁড়া, আমি নীলিমাদি'র কাছে তোকে নিয়ে যাচ্ছি, উনি এখন একটু ব্যস্ত আছেন।

শীলা ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, দেখিস ভাই আমার চাকরিটা যেন হয়, না হ'লে বড়ো অসুবিধা হবে।

জয়শ্রী হেসে বললো, দু'দিন পরে বিলেত ফেরতের বউ হবি, তোর আবার অসুবিধা কী শুনি?

শীলা বললো, পরে তোকে সব বলবো। সখ ক'রে যে চাকরি করছি না সেকথা তো বুঝতে পারিস।

একটু পরে জয়শ্রী শীলাকে নিয়ে নীলিমার ঘরে গেল। তার চেহারা দেখে অবাক হ'য়ে শীলা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। নীলিমাদি' যে এতো সুন্দর দেখতে সেকথা শীলা ভাবতে পারে নি। তার সিঁথিতে সিঁদুর দেখে সে আরও অবাক হ'য়ে গেল। কাল জয়শ্রীর মুখ থেকে নীলিমাদি'র কথা শুনে শীলা ভেবেছিলো এই আপিসের সেক্রেটারির সংগে তার বিয়ে হবে। বড়ো আজে বাজে কথা বলতে শিখেছে জয়শ্রী আজকাল।

জয়শ্রীর সংগে শীলাকে ঢুকতে দেখে মাথা তুলে তাকালো নীলিমা, একটু ব'সো তোমরা, তুমি এরই কথা আমাকে বলেছিলে জয়শ্রী?

হ্যাঁ নীলিমাদি'।

হেসে শীলাকে নীলিমা জিজ্ঞেস করলো, বড়ো কম বয়স তোমার—এই বয়সে বেশি পরিশ্রম করতে পারবে? অনেক কাজ এখানে—মৃদু স্বরে শীলা বললো, হ্যাঁ পারবো।

দাঁড়াও, আমি সেক্রেটারিকে তোমার কথা জানিয়ে আসি, জানো তো

চাকরির বাজার আজকাল খুব খারাপ, একটু গম্ভীর হ'য়ে নীলিমা বললো, তিনি কী বলেন কে জানে!

শীলার মুখ থেকে হঠাৎ এক সংগে অনেক কথা বেরিয়ে এলো, আপনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন নীলিমাদি', যেমন ক'রে পারেন আমাকে এখানে একটা চাকরি পাইয়ে দিন। না হ'লে আমার খুব অসুবিধা হবে—

নীলিমা উঠে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারির ঘরের দিকে যেতে যেতে হেসে বললো, দেখি তো।

এই জয়শ্রী, নীলিমা বেরিয়ে যেতেই শীলা বললো, নীলিমাদি'র তো বিয়ে হ'য়ে গেছে, তবে যে তুই বলেছিলি সেক্রেটারির সংগে ও'র—

ইসারায় শীলাকে চুপ করতে ব'লে ব্যস্ত হ'য়ে জয়শ্রী বললো, চুপ চুপ, এ আপিসে চাকরি হ'লে পরে সব কথা নিজেই জানতে পারবি।

হাসি মুখে নীলিমা ফিরে এসে বললো, এসো শীলা, উনি তোমাকে এখুনি ডাকছেন।

বুক কেঁপে উঠলো শীলার। এতোক্ষণ সে যেন যন্ত্র চালিতের মতো কাজ ক'রে যাচ্ছিলো। কী কথা বলবে সে সেক্রেটারির সামনে? তিনি যদি তাকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করেন? ভয়ে তার সর্বাংগ হিম হ'য়ে গেল। একবার মনে হ'লো, দরকার নেই চাকরি ক'রে—ডালহৌসী স্কোয়ারের সেই বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো শীলার।

সে বুঝতে পারলো না নীলিমার পেছন পেছন নিঃশব্দে কখন সেক্রেটারির ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঘরে এসে শান্তির নিশ্বাস ঝরলো শীলার। যতো ভয় ক'রেছিলো ততো ভয় পাবার কিছু নেই। শান্ত গম্ভীর কিন্তু স্নেহময় চেহারা সেক্রেটারির। চেহারা দেখে শীলা বুঝতে পারলো সে বাঙালী! শীলা দুই হাত তুলে নমস্কার করলো তাকে।

নীলিমা বললো, অবিনাশ বাবু, এর কথা আপনাকে বলেছিলাম। জয়শ্রীর বন্ধু—সবে ইস্কুল থেকে পাশ ক'রে বেরিয়েছে।

হাসি মুখে অবিনাশবাবু জিজ্ঞেস করলো, চাকরি করতে পারবেন না দু'দিন পর বিরক্ত হ'য়ে ছেড়ে দেবেন?

না না, শীলা বললো, ছাড়বো না।

আশ্চর্য! আর কোনো কথা অবিনাশ বাবু জিজ্ঞেস করলো না। শুধু নীলিমাকে বললো, ঠিক আছে। একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখিয়ে নিন। কাল থেকে আপিস করুক।

নীলিমা বললো, তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি এঁর সংগে কথা ব'লে একটু পরে যাচ্ছি।

বাইরে বেরিয়ে এসে শীলার সমস্ত শরীর আনন্দে কাঁপতে লাগলো। সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে এতো সহজে এক কথায় তার চাকরি হ'য়ে গেল। যাক, এইবার সে নিশ্চিন্ত। কতো মাইনে পাবে সে জানে না। কিন্তু তবু তার মনে হ'লো, যাই পাক না কেন মা'র হাতে সে সব টাকা তুলে দেবে, যেন কথায় কথায় তিনি বাবার লেখার আর ব্যাঘাত না করেন।

নীলিমা তাকে সংগে নিয়ে আবার তার ঘরে এলো। সে যেমন বললো শীলা ঠিক তেমনি ক'রে দরখাস্ত লিখে তার হাতে দিলো। কাল সকাল দশটা থেকে তাকে আপিস করতে হবে। এখন সব নিয়ে সে মাইনে পাবে, এক শো পাঁচ টাকা। ভালো ক'রে কাজ করতে পারলে পরে মাইনে আরও অনেক বাড়বে।

নীলিমাকে নমস্কার ক'রে জয়শ্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শীলা সেই আপিস থেকে বেরিয়ে এলো ডালহৌসী স্কোয়ারে।

তখন ভরা দুপুর। শীতের আমেজ থাকলেও তাজা সূর্যের আলোয় বেশ গরম লাগে। রাস্তায় অনেক লোক। এর আগে এমন ক'রে

ডালহৌসী স্কোয়ার কখনও দেখেনি শীলা—এদিকে আসেও নি কখনও। আজ চারপাশে তাকিয়ে ওর নিজেকে মনে হ'লো ব্যস্ত মানুষ। কাল থেকে অন্য কোনো দিকে মন দেবার সময় পাবে না ও। দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা অবধি চাকরি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে সোজা বাড়ি ফিরে যাবে।

মা'র কথা মনে ক'রে পথ চলতে চলতে দুঃখ হ'লো শীলার। কোনো সখ নেই বেচারীর। সংসারের ভাবনা করতে করতে বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। প্রথম মাসের মাইনে থেকে শীলা মা'কে একটা দামী শাড়ী কিনে দেবে।

তারপরই শীলার বাবার কথা মনে পড়লো। যাক, এতোদিন পর সে বাবার কাজে লাগতে পারলো। না, তাঁকে কিছুতেই চাকরি করতে দেওয়া যেতে পারে না। বাবাকে থেকে থেকে তার সন্ন্যাসীর মতো মনে হয়। সংসারের কোনো কিছুতেই তাঁর মন নেই। মাইনে পেয়ে বাবাকে একটা ভালো কলম কিনে দেবে সে।

বাড়ী ফিরে ছোটো মেয়ের মতো মা'কে জড়িয়ে ধ'রে শীলা বললো, মা আমার চাকরি হ'য়ে গেছে। কাল থেকে আপিস করতে হবে। একশো পাঁচ টাকা মাইনে—

গম্ভীর মুখে সুলতা শুধু বললো, বাঁচা গেল. একটু থেমে সে যেন আপন মনে আবার বললো, এও কপালে ছিলো!

কমলেশকে বলবার জন্যে শীলা পাশের ঘরে এসে থমকে দাঁড়ালো। মাথা নিচু ক'রে এক মনে লিখে যাচ্ছে কমলেশ। বাবার ধ্যান ভাঙিয়ে কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করলো না তার। সে নিঃশব্দে আবার বেরিয়ে গেল।

তারপর উত্তেজনায় সারাক্ষণ কাটলো। শীত লাগছে বেশ। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিলো শীলা। কাল থেকে শুরু হবে তার নতুন জীবন।

হঠাৎ শীলার মনে পড়লো বিকাশের কথা। সে এ খবর শুনলে কী ভাববে কে জানে। বোধহয় অবাক হ'য়ে যাবে। শীলা যে কোনদিন চাকরি করতে পারবে সে কথা কল্পনা করতে পারেনা বিকাশ। ফিরে এসে একবার দেখুক. শীলা ভাবলো বিকাশ যতো বোকা মনে ক'রে সে মোটেই ততো বোকা নয়। ইচ্ছে করলে সে সব করতে পারে। কবে ফিরবে বিকাশ?

প্রায়ই চিঠি আসে তার। বিলেতের অনেক খবর দিয়ে বিকাশ লম্বা লম্বা চিঠি লেখে। সেখানে সে বেশ গুছিয়ে বসেছে। কিন্তু পড়াশুনো করতে একেবারে ভালো লাগছেনা তার। সব সময় শীলার কথা ভেবে বিকাশের মন খারাপ হ'য়ে যায়।

কমলেশ নিয়মিত বিকাশের চিঠির উত্তর দেয়। কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও শীলা একলাইনও লিখতে পারে না। কেমন যেন লজ্জা করে তার বাবা কী ভাববে? মা কী মনে করবে? এমনি নানা কথা ভেবে শেষ অবধি বিকাশকে তার আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনা। কিন্তু এবার একটা উত্তর না লিখলেই নয়। শেষ চিঠিতে বিকাশ রীতিমত অভিমান করেছে। চোখের আড়ালে চলে এসেছি ব'লে তুমি কি একেবারে ভুলে গেলে শীলা? তুমি কি বুঝতে পারোনা তোমাদের একেবারে না দেখে কি ভাবে আমার দিন কাটছে? তাহ'লে কেমন করে নীরব থাকো?

বুঝতে পারবেনা কেন? শীলা সবই বুঝতে পারে। কিন্তু কেমন করে চিঠি লিখবে সে? বিকাশ কিছু বুঝতে পারেনা কেন! কোথায় বসে সে চিঠি লিখবে তাকে? মা বাবার সামনে কিছুতেই শীলা তাকে চিঠি লিখতে পারবেনা।

সে ঠিক করলো এবার হয় আপিসে ব'সে একসময় না হয় ছুটির পর কোন দিন জয়শ্রীদের বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখে সব কথা বুঝিয়ে দেবে।

অব্যক্ত উত্তেজনায় সে রাত্রে অনেক্ষণ ঘুম এলোনা শীলার।

পাঁচ

প্রথমে যতো ভয় করেছিল চাকরি করতে এসে দেখলো তত ভয় করবার কিছু নেই। খুব সহজে সে তার কাজ বুঝে ফেললো। কঠিন কিছু নয় আপিসে যতো চিঠি আসে তাকে তার হিসেব রাখতে হয়। মোটা খাতা আছে, সেই খাতায় সব চিঠির বিষয় বস্তু সংক্ষেপে ইংরেজিতে লিখে রাখতে হয়। সকলের ব্যবহার খুব ভালো। তাই খুব অল্পদিনের মধ্যে এখানে নিজেকে মানিয়ে নিতে শীলার কোনো অসুবিধা হলোনা।

মাঝে মাঝে আপিসের পর শীলা সোজা বাড়ি ফিরে আসেনা, জয়শ্রীর সংগে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কোনো কোনোদিন ওরা একসংগে চা খেতে যায়, কোনোদিন বায়স্কোপ দেখে আর কোনোদিন জয়শ্রীদের বাড়ীতে ব'সে অনেকক্ষণ গল্প করে।

জয়শ্রীকে অনেক সময় শীলা ঠিক বুঝতে পারেনা। এই আপিসের অল্পবয়সী সব ছেলের সংগে তার খুব বেশি ভাব। তাদের ডিপার্টমেণ্টে তরুণ ব'লে একটি ছেলে কাজ করে। কালো লম্বা মিষ্টি চেহারা। তাকে দেখলেই শীলার বিকাশের কথা মনে পড়ে যায়। ছেলেটি লাজুক। কথা বলে খুব কম। জয়শ্রী আর তরুণের কথাবার্তা শুনে ধরে নিয়েছিল ওদের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে।

কিন্তু তারপর যতো ছেলের সংগে জয়শ্রীকে কথা বলতে দেখেছে সে ব্যবহারের কোন প্রভেদ খুঁজে পায়নি। সকলের সংগে সে একই রকম ব্যবহার করে। এমন আত্মীয়তা ক'রে কথা বলে যে মনে হয় ওরা পরস্পরের বড়ো আপনার।

জয়শ্রীর এই চালচলন ভালো লাগেনি শীলার। প্রথমে সে ভেবে-ছিল আপিসে সব মেয়েরা বুঝি ছেলেদের সংগে এমনি ক'রে মেশে। কিন্তু যতো দিন যেতে লাগলো আর তার সংগে নানা বিভাগের অন্যান্য মেয়েদের আলাপ হ'লো ততোই সে বুঝতে পারলো জয়শ্রী যেন একমাত্র ব্যতিক্রম।

এখান ওখান থেকে আরও নানা কথা শুনলো সে জয়শ্রীর সম্পর্কে।

কিন্তু সব কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না শীলার। তাকে সে এতো ভালো ভাবে জানে যে তার দৃঢ়বিশ্বাস জয়শ্রী কিছুতেই খারাপ হ'তে পারে না। সে ঠিক করলো, একদিন এ বিষয়ে তার সংগে স্পষ্ট আলোচনা করবে।

ওদিকে নীলিমাদি'র ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। তবে তার কাজটা একটু উঁচুদরের। তাই তার সম্পর্কে পাঁচজন আভাসে ইংগিতে নানা কথা বললেও একেবারে স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলে না। কারণ তাকে চটালে চাকরি থাকবে না।

শীলা এসব ব্যাপার ভালো বোঝে না। কিন্তু নীলিমাদি'র সম্বন্ধে যাই শুনুক না কেন, সুযোগ পেলে তার চেহারার দিকে সে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে। আর মনে মনে ভাবে, এমন রূপ যার তার একটু আধটু দুর্নাম থাকবে না তো আর কার থাকবে। শীলা শ্রদ্ধা করে নীলিমাকে। সে না থাকলে এই আপিসে এতো সহজে তার চাকরি কিছুতেই হ'তো না।

ওদিকে কেমন ক'রে যেন সারা আপিসময় ছড়িয়ে গেছে শীলার শিগ্‌গিরই বিয়ে হবে। যার সংগে বিয়ে হবে সে নাকি এখন বিলেতে আছে। এসব খবর এখন থেকে এমন ক'রে ছড়িয়ে বেড়াবার কী দরকার! জয়শ্রীর ওপর রাগে শীলার সমস্ত শরীর জ্ব'লে যায়। মেয়েটার স্বভাব গেল না আজও। চিরদিন এমনি আজে বাজে কথা

বলে। হয়তো এ খবর শুনে আপিসের কোনো ছেলে শীলার সংগে বেশি মেশামেশির চেষ্টা করে না। প্রথম প্রথম যারা নানা কথা বলে আলাপ করতে এসেছিলো কিংবা বাইরে কোথাও একদিন চা খেতে যাবার কথা বলেছিলো তারা এ খবর শুনে শুকনো নমস্কার ক'রে প্রত্যহ স'রে যেতে লাগলো। শীলা মনে মনে হেসে ভাবে বোধ হয় তারা আবার জয়শ্রীকে নিয়েই মেতে উঠলো।

এই জয়া, একদিন সুযোগ পেয়ে জয়শ্রীকে শীলা জিজ্ঞেস করলো, আমার নামে সকলকে ওসব যা—তা ব'লে বেড়াচ্ছিস কেন?

কী? চোখ বড়ো করে জয়শ্রী বললো, তোর নামে আমি যা-তা ব'লে বেড়াবো?

বিকাশ বিলেতে আছে এসব কথা এদের বলবার দরকার কী?

শান্তির নিশ্বাস ফেলে জয়শ্রী বললো, ও তাই বল। এইজন্যে তোর এতো ভাবনা?

ভাবনা নয় কেন? কী হবে তার ঠিক নেই, আগে থেকে ঢাক পিটিয়ে সেকথা লোককে জাহির করে লাভ কী?

বলিস কী! অবাক হবার ভান করে জয়শ্রী বললো, পরিনতি সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে নাকি?

শীলা হাসলো, মানুষের মনের খবর কে রাখে!

এসব তো ভালো কথা নয় শীলা, স্বরে রসিকতা মিশিয়ে জয়শ্রী বললো নতুন করে কেউ মনে দোলা দিয়েছে নাকি?

দূর!

সাবধানে থাকিস, এদিক ওদিক তাকিয়ে জয়শ্রী বললো, যার তার আজে বাজে কথায় ভুলে অমন ভালো বর হাত ছাড়া করিস না। তাহলে দুঃখ পাবি বলে দিলাম।

চেষ্টা করে কিংবা জোর করে আমি কাউকে ধরে রাখতে চাই না—ওসব বাজে কথা রাখ। আসল ব্যাপারটা এবার ভেঙে বলি। পাছে কেউ তোকে নিয়ে মাতামাতি করে তাই আমি একেবারে প্রথম থেকে সে পথ বন্ধ করে দিয়েছি—

কিছু না বুঝে বাধা দিয়ে শীলা জিজ্ঞেস করলো, তার মানে?

মানে ইচ্ছে করে সকলকে বলে দিয়েছি যে তোর বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে।

আর কথা না বাড়িয়ে শীলা বললো, বেশ করেছিস।

এই আপিসে চাকরি পাবার পর মাত্র অল্প কয়েক দিনের মধ্যে শীলা যেন মনে মনে বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। যে সব কথা সে আগে কখনও ভাবেনি আজকাল সে সব কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে।

সমাজের অনেক বন্ধ জানলা যেন দেখতে দেখতে তার চোখের সামনে খুলে গেছে। সে এখন বুঝতে পেরেছে যে মনের নানা তাগিদে মানুষকে ইচ্ছে না থাকলেও অনেক সময় অনেক কাজ করতে হয়। জয়শ্রীকে সে এতো ভালো করে জানতো কিন্তু আগে তাকে এমন মমতা দিয়ে বুঝতে পারে নি। তাকে ভুল্ বুঝেছিলো বলে লজ্জা পেলো।

এই আপিসের নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনে আর জয়শ্রীর দৈনন্দিন চাল চলন দেখে তার ওপর শীলার মনের মধ্যে একটা চাপা বিদ্বেষ জমে উঠেছিলো। তরুণও তার কাছে একদিন জয়শ্রীর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুঃখ করেছিলো। সে দিন খুব খারাপ লেগেছিল শীলার।

কয়েকদিন আগেকার ঘটনা। তরুণ আপিসের পর শীলা আর

জয়শ্রীকে এক রেস্তোরাঁয় তার সংগে চা খেতে বলেছিলো। খুশি হয়ে রাজি হয়েছিলো শীলা। কেন না জয়শ্রী সংগে থাকলে তার এ নেমন্তন্ন গ্রহণ না করবার কী কারণ থাকতে পারে। আপিস থেকে ওরা তিনজন যথাসময়ে বেরিয়েছিলো সেদিন।

কিন্তু শীলা লক্ষ্য করছিলো প্রথম থেকেই জয়শ্রী বড়ো বেশি ছটফট করছে। একবার সামনে তাকাচ্ছে, একবার পেছনে চাইছে, ওদের কারোর কথা ভালো করে শুনছে না। অবশ্য জয়শ্রীর সংগে দেখা হবার পর থেকে শীলা লক্ষ্য করছে ইস্কুলের সেই শান্ত জয়শ্রী আর নেই। তবু আজকের বাড়াবাড়ি তার একেবারেই সহ্য হচ্ছিলো না।

হঠাৎ এক কাণ্ড হলো। তারা সবে চায়ের কাপে চমুক দিতে যাবে এমন সময় সেই রেস্তোরাঁর সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। যেখানে বসে ওরা চা খাচ্ছিলো সেখান থেকে রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায়। ট্যাক্সি থেকে যে নামলো সে ওদেরই আপিসে চাকরি করে। তার নাম ঠিক তখনি মনে পড়লো না শীলার। কিন্তু সে লক্ষ্য করলো তাকে এগিয়ে আসতে দেখে তরুণের মুখ কালো হয়ে গেল। হয়তো চাপা উত্তেজনায়, কিন্তু শীলা বোঝে সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠা তরুণের স্বভাব নয়।

ওদিকে জয়শ্রী কিন্তু তাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আসুন মলয় বাবু, এক কাপ চা খেয়ে যান—

না না, সেই লোকটি সকলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, চা খাবার আর সময় হবে না। চল জয়শ্রী, ওদিকে শো যে আরম্ভ হয়ে গেল—

কিছু মনে করিস না ভাই শীলা, আজ আমার মলয় বাবুর সংগে ছবি দেখতে যাবার কথা, আমিই ওকে এখানে আসতে বলেছিলাম—কাউকে আর কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপে

শেষ চুমুক দিয়ে জয়শ্রী মলয়ের সংগে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

জয়শ্রীর এমনি করে চলে যাওয়াতে তরুণের কী মনে হলো সে খবর রাখে না শীলা। কিন্তু কোথা থেকে রাজ্যের লজ্জা এসে যেন তাকে ঘিরে ধরলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কোনো স্বাদ পেলো না। তরুণের দিকে মুখ তুলে আর তাকাতে পারলো না শীলা।

একটু পরে বোধ হয় জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে তরুণ জিজ্ঞেস করলো, কই আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না? মুখ বুঝে কী ভাবছেন অতো?

না, মানে, আর কি—তরুণের স্পষ্ট প্রশ্নের শীলা কী ভাবে উত্তর দেবে ঠিক করতে পারলো না।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে তরুণ বললো, জয়শ্রীর ব্যবহার দেখে অবাক হবেন না। ওর স্বভাব অমন ছেলেমানুষের মতো—আপনি তো ওকে ছেলেবেলা থেকেই জানেন!

খুব আস্তে শীলা বললো, আগে কিন্তু ও এমন ছিলো না। ওর স্বভাবের সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

কী জানি, একটু চুপ করে থেকে তরুণ বললো, পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানি না, তবে অনেক সময় ও নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারে না।

আপনি বুঝিয়ে দেন না কেন?

তরুণ হাত থেকে কাপ নামিয়ে রেখে ম্লান হেসে বললো, দু'একবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ফল হলো না। ও ভাবলো আমি স্বার্থপর বলে ওর চলাফেরার গণ্ডি টেনে দিতে চাচ্ছি।

এতে স্বার্থপর ভাববার কী আছে, যারা মঙ্গল চায় তারা তো অনেক কিছু করতে বারণ করে।

শীলার স্বরে সমবেদনার রেশ পেয়ে তরুণের মনে হলো তাকে সব

কথা খুলে বলে। আসলে তরুণ চাপা স্বভাবের ছেলে। সহসা লোককে নিজের ব্যক্তিগত কথা বলতে সে ইতস্তত করে। কিন্তু কিছুদিন ধরে তার কারোর কাছে মন খুলে সব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আজ কাল জয়শ্রীর ভাবনা তাকে কোনো কাজে মন দিতে দেয় না। থেকে থেকে তার সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে যায়।

জয়শ্রী যেদিন প্রথম এ আপিসে চাকরি করতে আসে সেইদিনই তরুণের সংগে তার আলাপ হয়। তার ওপর ভার পড়ে জয়শ্রীকে কাজ কর্ম বুঝিয়ে দেবার।

না বললেও চলে এর আগে আর কোনো মেয়ের এতো কাছাকাছি তরুণ কখনও আসে নি। প্রথম থেকেই জয়শ্রীকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু মুগ্ধ হলেও স্পষ্ট ভাষায় মুখ ফুটে জয়শ্রীকে সেকথা জানায়নি। কিন্তু তার বিশ্বাস ছিলো একদিন তার কাজের মধ্য দিয়ে সে তরুণের মনের কথা বুঝতে পারবেই। শুধু স্পষ্ট করে বললেই মর্য্যাদা পাওয়া যায়না। মূল্য পেতে হলে দৈনন্দিন প্রতি মুহূর্তের কাজের মধ্যে দিয়ে তা আদায় করে নিতে হয়।

ছেলেবেলা থেকে কোনো বন্ধন তরুণের ছিলনা। সে মামা বাড়িতে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে। মা বাবা অনেক আগেই মারা যান। তবু তাকে বেঁচে থাকতে হবে। তাই মামার বাড়িতে তার থাকবার ব্যবস্থা চাকর বাকরের মতো হলেও সে কোনদিন অনুযোগ করেনি। কার কাছে অনুযোগ করবে! তবু নিজের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিলো। সে জানতো, যেমন করে হোক সে একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবে—মানুষ হবে।

অবহেলার মধ্যে মানুষ হয়েছে বলে তরুণ কারোর কাছে কিছু আশা করেনি শুধু কাজ করবার নেশা জেগেছিলো তার। সে জানতো কাজের

মধ্যে দিয়ে সব মানুষের সব কিছু যন্ত্রনা থেকে মুক্তি আসে। তাই ছাত্র জীবনে পড়াশুনোর মধ্যে সে ডুবে থাকতো।

মামার ছেলেরা যখন ভালো ভালো মাস্টারের কাছে পড়েও বছরের পর বছর এক ক্লাশে থাকতো তরুণ তখন যেন হাসতে হাসতে কৃতিত্বের সংগে পরীক্ষার বেড়া পার হয়ে যেতো।

তারপর একদিন নিজের চেষ্টায় সে এ আপিসে চাকরি যোগাড় করে নিলো। মামার আশ্রয় ছেড়ে এসে উঠলো হ্যারিসন রোডের এক মেসে।

নিজের কোনো অসুবিধা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি তরুণ। শৈশব থেকে অত্যন্ত অগোছাল পরিবেশের মাঝেও সে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু জয়শ্রীর সংগে আলাপ হবার পর তার মন যেন কিসের কাঙাল হয়ে উঠলো। মনে হয় কেউ থাকুক তার কাছে কাছে, অসীম স্নেহে ভরে দিক তার বুক, তার এতোদিনের জমা ক্লান্তি কোমল স্পর্শে মুহূর্তে দূর করে দিক। জয়শ্রীর সংগে আলাপ হবার পর তরুণের মনের এতোদিনের উপবাস যেন অসহ্য হয়ে উঠলো।

শীলা জিজ্ঞেস করলো, এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবেন আপনি ?

কোনো ঠিক নেই, সাধারণত মেসে ফিরে যাই।

মেসে ? একটু অবাক হয়ে শীলা বললো, আপনার আত্মীয়েরা সব কলকাতার বাইরে থাকেন বুঝি ?

না, হাসলো তরুণ, মা বাবা নেই আমার। মামার বাড়ি এখানেই। আমি সেখানে পড়াশুনো করেছি।

এখন সেখানে থাকেন না কেন ?

শীলার কৌতূহল তরুণের ভালো লাগলো। কিছুক্ষণ চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে তরুণ বললো, বুঝতে পারি

আমি থাকলে ওদের অসুবিধা হয়, তাই ভাবলাম চাকরি যখন করছি তখন শুধু শুধু ওদের অসুবিধা বাড়িয়ে কী লাভ। আর ওরা তো রেখে-ছিলেন আমাকে অনেকদিন।

শীলা বুঝতে পারলো হঠাৎ তরুণকে এমন ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা তার উচিত হয়নি। তাই আর কোন কথা না বলে সে শুধু বললো, চলুন আজ ওঠা যাক—

আপনি কোথায় যাবেন ?

সোজা বাড়ি যাবো, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। মা বড়ো ভাবনা করেন—

বিল চুকিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তরুণ বললো, চলুন আপনাকে বাসে তুলে দি—

চলুন।

বাস ষ্টপে দাঁড়িয়ে তরুণ আবার বললো, আপনার বাবার সংগে এক-দিন আলাপ করবার ইচ্ছে আছে, ওঁর লেখা এত ভালো লাগে আমার !

আপনি নিজে লেখেন বুঝি ?

না না। কিন্তু পড়তে খুব ভালোবাসি।

আপনাকে একদিন আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবো। বাবাও আপনার সংগে কথা বলে খুশি হবেন।

হেসে তরুণ জিজ্ঞেস করলে কেমন করে বুঝলেন ?

শীলা বললো বাবা কেমন লোক পছন্দ করেন তা আমি খুব ভালো করেই জানি।

খুশি হয়ে তরুণ বললো, দেখা যাক আমার সংগে আলাপ করবার পর উনি কী বলেন।

সেই সন্ধ্যায় বাসে বাড়ি ফিরতে ফিরতে জয়শ্রীর ওপর বিতৃষ্ণায় শীলার

মন ভরে উঠলো। ও ঠিক করলো কাল ছুটির পর ওদের বাড়ি গিয়ে ওর সংগে ঝগড়া করবে। একটা ভাল লোককে নিয়ে এমন ছেলেখেলা করবার কী অধিকার তার আছে। যদি আজ তার অন্য কারোর সংগে বায়স্কোপ দেখতে যাবার কথা ছিলো তাহলে কী দরকার ছিলো তরুণের সংগে চা খেতে এসে শুধু শুধু তাকে ব্যাথা দেবার। অমন করে মাঝ পথে উঠে যাওয়া শুধু অভদ্রতা নয়, অন্যের পক্ষে অপমানকরও। আর তরুণের মতো ছেলে পাওয়া জয়শ্রীর সৌভাগ্য। প্রথম থেকেই শীলার তাকে ভাল লাগে। তারপর তার কথাবার্তা শুনে তার ওপর শ্রদ্ধা জাগলো তার। আর আজ তার সংগে কথা বলে কী জানি কেন, তরুণের জন্যে শীলার মমতা জাগলো। শুধু মনে হলো, বেচারি একা মেসে ফিরে যাবে—কেউ নেই ওর দেখাশুনো করবার!

বাড়ি আসতেই সুলতা বললো, কোথায় থাকিস শীলা এতোক্ষণ? কতো রাত হয়ে গেল!

শীলা হেসে বললো, রাত কোথায় মা? এইতো সবে সন্ধ্যে হলো। শীতকাল কিনা তাই মনে হয় অনেক রাত—থাকিস কোথায়?

আপিসের পর জয়শ্রীর সংগে চা খেতে গিয়েছিলাম।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে যেন আপন মনে সুলতা বললো, এমনি করেই ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাবে, প্রথমে এর সংগে চা খেতে যাবে তার পর ওর সংগে বায়স্কোপে যাবে, তারপর রাত বারোটায় বাড়ি ফিরবে। ওই টুকু বয়সে চাকরি করলে এমনি হবে—

ছি মা, শীলা হেসে বললো, কী সব যাতা বলছো, আমাকে তুমি একটুও ভালোবাসো না না?

হয়েছে হয়েছে যা, এখন জামা কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম কর, বলবো আর

কাকে ? সবই তোমার কপালের দোষ !

শীলা বললো আমরা খুব ভাল আছি মা। আরও কতো লোক আমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে ! আপিসে অনেক লোককে দেখছি কিনা !

তোর বাবার মতো কথা আমাকে শোনাস্ নি শীলা, শুনলে গা জ্বালা করে।

একটু গম্ভীর স্বরে শীলা বললো, বাবা কিছু ভুল কথা বলেন না মা !

আমি শুধু বাজে কথা বলি না ?

মা'র সংগে তর্ক করবার ইচ্ছে শীলার ছিলোনা। কোনোদিনও সে সুলতার সংগে তর্ক করেনা। মা'র দুঃখ সে বুঝতে পারে। তবু তার মনে হয় কমলেশের ওপর সুলতা অবিচার করে। সংসারে যতোই অভাব থাক বাবার কোথাও একতিল ফাঁকি দেখতে পায়না শীলা। কমলেশকে সে শ্রদ্ধা করে। তার বাবার মতো বাবা ক'জনের থাকে।

মা'র সংগে আর কোনো কথা না বলে সে কমলেশের ঘরে চলে এলো। কমলেশ ঘরে নেই। আজকাল প্রায়ই সে বেড়াতে বেরোয়। হয় বন্ধু বান্ধবের বাড়ি যায়, নয় এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে শীলাও যায় তার সংগে। তাকে আজ কাল অনেক আবোল তাবোল প্রশ্ন করে সে। কমলেশও হাসি মুখে সেগুলির উত্তর দিয়ে যায়।

কমলেশের ঘরে এসে আলো জেলে শীলা দেখলো টেবিলের ওপর তার নামে একটা চিঠি পড়ে আছে। বিকাশ লিখেছে লণ্ডন থেকে অনেক দিন পর তার চিঠি এলো। তাই মধুর উত্তেজনায় আগ্রহের সংগে তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে শীলা পড়তে লাগলো। কিন্তু চিঠি পড়তে পড়তে

সে অবাক হয়ে গেল। বিকাশ যে এমন অবুঝের মতো লিখবে তা সে ভাবতে পারে নি। এই চিঠিতে আর বিশেষ কিছু নেই। শুধু শীলার চাকরি সম্বন্ধে নানা কথা লিখেছে বিকাশ।

সে লিখেছে, চাকরি না করলে কি কিছুতেই চলতো না শীলার? কী দরকার ছিলো অমন একটা যাতা চাকরি করবার। খেতে না পারার অবস্থা নয় তাদের। একেই শীলার সম্বন্ধে তার বাবার অনেক কথা বলবার আছে। এখন এমন চাকরি করা মেয়েকে তিনি বউ করতে না চাইলে বিকাশ কেমন করে তার সংগে যুদ্ধ করবে? সব বুঝে, সব জেনে এমন অবুঝের মতো কাজ শীলা কেন করলো? বিকাশ চেয়েছিলো শীলা পড়াশুনো করে। কেন তার কথা রাখলো না শীলা?—এমন আরও অনেক কথা লিখেছে বিকাশ যা পড়তে পড়তে শীলার মাথা গরম হয়ে উঠলো। তারপর রাগে দুঃখে অপমানে চোখ থেকে জল বেরিয়ে এলো তার। তাকে এমন তাচ্ছিল্য করে এসব কথা লেখবার কী অধিকার বিকাশের। তার যা খুশি সে তাই করবে। স্বার্থপর। শুধু নিজের কথাই ভাবতে শিখেছে। কেন চাকরি করছে সেকথা ভালোভাবে তাকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারতো না। তার বাবা আছে—আর শীলার কি কেউ নেই নাকি? তখুনি বিকাশকে উত্তর লিখে দিলো শীলা। শুধু কয়েকটি লাইন। তার যা খুশি সে তাই করবে, কাউকে কোনো কৈফিয়ৎ দেবে না। আর ভবিষ্যতে এমন অপমানকর চিঠি যেন বিকাশ কখনও তাকে আর না লেখে।

সারা রাত ঘুম এলোনা শীলার। দুঃসহ যন্ত্রণায় তার শরীর মন জ্বলতে লাগলো। কেন মানুষের এমন সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়। বিকাশ তো কখনও তার সংগে এমন করে কথা বলতো না। বিলেতে গেলে মানুষ কি রাতারাতি এতো স্বার্থপর হয়ে যায়। কিছুতেই শীলা বিয়ে

করতে পারবে না বিকাশকে। অবহেলা আর অপমানের মধ্যে বাস করার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। যাকে খুশি বিয়ে করুক বিকাশ। শীলার মতো মেয়েকে সে যেন কখনও দয়া দেখাতে না আসে।

সারা রাত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে উঠলো শীলার!

জয়শ্রীর সংগে তরুণ সম্পর্কে আলোচনার কথা শীলা ভোলে নি। তার নিজের দুঃখ যতো প্রবল হোক, পরের দুঃখ তার কাছে আরও গভীর। আর কমলেশের দেয়া অনেক উপদেশের মধ্যে একটি বিশেষ উপদেশ তার প্রায়ই মনে পড়ে, জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন, সব কিছু সহজ ভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করো।

তবু অপমানের ধাক্কা সামলে উঠতে শীলার কয়েকদিন লাগলো। দু'দিন সে আপিসে গেল না। সুলতাকে বললো, শরীর খারাপ। তারপর জোর করে মুখে হাসি টেনে আবার যথারীতি সেজেগুজে আপিসে যেতে লাগলো।

যে দিন প্রথম আপিসে গেল, শীলা ভেবেছিলো সেদিন ছুটির পর জয়শ্রীর সংগে তাদের বাড়ি যাবে। কিন্তু জয়শ্রীকে পাওয়া মুস্কিল। আপিসের পর সে খুব কম দিন সোজা বাড়ি যায়। আজ এর সংগে বেড়াতে যায়, কাল ওর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যায়, পরশু তার সংগে বায়স্কোপ দেখতে যায়। যাহোক একদিন জোর করে জয়শ্রীকে শীলা ধরে নিয়ে গেল। আপিসে ওসব কথা বলা সম্ভব নয়। আর শীলার মনে হলো যতোদিন যাচ্ছে ততো ক্ষতি হচ্ছে জয়শ্রীর। জীবন যাত্রার এমনি ধারা তাকে বদলে ফেলতে হবেই।

কী এমন দরকার তোর আমার সংগে? নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে শীলার

সংগে সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরে এসে জয়শ্রী বললো, তোর বিকাশের কথা কিছু বলবি বুঝি?

না তোর সংগে ঝগড়া করবো।

শুধু ঝগড়া করবার জন্যে আমাকে এই সাত সকালে বাড়ি টেনে আনলি?

হ্যাঁ, কিছু মনে করিস না ভাই জয়া, তোর সংগে সত্যি আজ আমি ঝগড়া করবো।

বিষণ্ণ মুখে শীলার পাশে খাটের ওপর বসে পড়ে জয়শ্রী বললো, তোর যা খুশি কর।

তুই মানুষকে এতো কষ্ট দিস কেন জয়া?

কা'কে আমি .কষ্ট দিলাম?

দু' এক মিনিট ইতস্তত করে শীলা বললো, তরুণকে। অমন ভালো লোককে তুই এমন করে আঘাত দিতে পারিস?

জয়শ্রী শীলার প্রশ্ন শুনে কিছু বললো না। শুধু বেদনার ছায়া নামলো তার মুখে। একটু পরে শীলার আরও কাছে সরে এসে সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো, ও তোকে কিছু বলেছে বুঝি?

না, জানিস তো ও তেমন লোক নয়, একটু থেমে শীলা বললো, কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি।

কী বুঝতে পারিস?

ও তোকে গভীরভাবে ভালবাসে?

জয়শ্রী ম্লান হেসে বললো, যে কথা আমি আজও বুঝতে পারলাম না, সেকথা তুই তো বেশ তাড়াতাড়ি বুঝে গেছিস দেখি—

আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিস না জয়া। তুই কি সত্যি কিছু বুঝিস না নাকি?

জয়শ্রী বললো, বুঝি।

তাহলে ? ওর ওপর তোর কি কোন আকর্ষণ নেই ?

তা'ও আছে শীলা।

তাহলে তুই ওর সংগে অমন ব্যবহার করিস কেন?

উপায় নেই বলে —

কিসের উপায় নেই ? রেগে গিয়ে শীলা বললো, তুই জানিস না কী সংঘাতিক পরিবর্তন এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে তোর হয়েছে ! এমন করে ঘুরে বেড়াতে তোর লজ্জা করে না জয়া ?

অবাক হয়ে জয়শ্রী বললো, তুই কী বলছিস শীলা ?

কিছু বুঝতে পারছো না না ?

না, সত্যি আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তুই কী বলবি ভালো করে বল।

কী ভেবে শীলা বললো, কেন যে তোকে ডাকে তুই তার সংগে যাস ?

তাতে কী হয়েছে ? ওরা তো আমার বন্ধু।

কিন্তু ওদের সংগে অমন করে ঘুরে বেড়ালে পাঁচজনে কী মনে করে বুঝতে পারিস না ? আর যে তোকে সত্যি ভালবাসে তুই তার দিকে ফিরেও তাকাস না—

শীলার কথা শুনে হাসি পেল জয়শ্রীর। সে শীলার পিঠে হাত দিয়ে বললো, কে বললো ফিরে তাকাই না। একদিন শুধু যে ফিরে তাকিয়েছিলাম তা নয়, তার জন্য সব করবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু—

সেটা আরও খারাপ করেছিস জয়া। সুলভ মেয়ের মতো একজনকে আশা দিয়ে নিরাশ করেছিস—

তা না করে কী করি বল ? আমি তো যা ইচ্ছে তাই করতে পারি না—

তাই তো করে বেড়াচ্ছিস তুই। তোর কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে নাকি ? জানিস তোর সম্বন্ধে আপিস সুদ্ধ লোকের কি ধারণা ?

জানি। কিন্তু তার জন্য আমি কী করবো? আপিস সুদ্ধ লোক যাই ভাবুক আমাকে তো বেঁচে থাকতে হবে।

তাই বলে তুই এমনি করে যা ইচ্ছে তাই করে বেঁচে থাকবি? একটু থেমে শীলা বললো, এমন করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।

জয়শ্রী অনেকক্ষণ শীলার কথার উত্তর দিলে না। আস্তে আস্তে তার কাছে থেকে বেশ দূরে সরে গিয়ে বসলো। তার ভাইরা চিৎকার করে খেলা করছে। রান্নাঘর থেকে মাঝে মাঝে জয়শ্রীর মার গলার স্বর ভেসে আসছে। শীত পড়ে গেছে বেশ। ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে এসে ওদের দু'জনের শরীরে কাঁপুনি লাগিয়ে দিচ্ছে। মনে হয় অনেক রাত।

ওপরে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে জয়শ্রী বললো, মরবো কেন শীলা? জীবনের কতটুকু দেখেছি আমি?

তাই বলে এমনি করে তুই জীবন দেখবি? তরুণের মতো ভালো ছেলেকে বিয়ে করলে কী অসুবিধা হতো তোর?

অনেক অসুবিধা হতো, মুখ নামিয়ে জয়শ্রী বললো, সেকথা তুই বুঝতে পারবি না।

তোর কিছুই আজকাল আমি বুঝতে পারিনা। কিন্তু আগে তো তুই এরকম ছিলি না।

তখন আমার উপার্জনে সংসার চলতো না।

আরও কতো মেয়ে তো চাকরি করে, তারা কি সকলে তোর মতো করে জীবন দেখে?

কী ভেবে জয়শ্রী বললো, তুই শুধু আমার দোষ ধরছিস শীলা, কিন্তু আমি যে কতোটা নিরুপায় সেকথা ভেবে দেখছিস্ না।

সকলেই নিরুপায়—

না, বাধা দিয়ে বেশ জোরে জয়শ্রী বললো, আমার মতো অসহায় কেউ

নয়, কোন্ মেয়ে নিজের বিয়ের কল্পনা না করে? কিন্তু আমি কিছুতেই সেকথা ভাবতে পারি না। আমি বিয়ে করে এ বাড়ি থেকে চলে গেলে এ সংসার ধ্বসে পড়বে।

কেন জয়া?

সেকথা বুঝতে পারবি না জানি। তোরা শুধু আমাকে নানা উপদেশ দিয়ে গালমন্দ করতে পারিস, জয়শ্রী হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলো, কী আছে আমার জীবনে? কেমন করে আমি ভালবাসবো? কেমন করে আমি কারোর ভালবাসাকে প্রশ্রয় দেবো বলতে পারিস?

বিচলিত হয়ে শীলা বললো, কিন্তু পারবিনা কেন?

তাহলে কে আমার মাকে দেখবে? কে আমার ভাই বোনদের মানুষ করবে? তোর মাথার উপর বাবা আছেন, কিন্তু আমার কে আছে বল? আর পাঁচজন যে কথা ভাবে আমি সেকথা ভাবতে পারি না, তোরা যে ভাবে জীবনকে দেখিস আমার সে ভাবে দেখবার অধিকার নেই। এতো কম বয়সে কী আমার যন্ত্রণা তা তোকে বোঝাতে পারবো না। আমি শুধু যন্ত্রের মতো এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়াই—

জয়শ্রীর কাছে সরে এসে শীলা বললো, তা বলে কাউকে ভালোবাসতে পারবি না কেন? সে তোর জন্যে হয়তো অনেকদিন অপেক্ষা করতে পারে?

একজনকে শুধু শুধু আমি বঞ্চিত করে রাখবো কেন? আমার জন্যে তাকে সারা জীবন অপেক্ষা করিয়ে রেখে লাভ কী? আমার ভাইদের তো দেখেছিস, ওদের মানুষ হতে এখনও অনেক দেরি।

সব বুঝতে পারি আমি জয়া, জয়শ্রীর একটা হাত কোলের ওপর তুলে নিয়ে শীলা বললো, তবু তুই যদি কাউকে ভালোবাসিস তাহলে অনেক শান্তি পাবি। বিয়ের কথা তো চট করে ভাবা যায় না।—

আমি তরুণকে ভালোবাসি শীলা।

তাহলে ওকে এমন আঘাত দিস কেন?

জানি না। আমি চাই না ও আমাকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন রচনা করে। ওকে স্পষ্ট করে মর্মান্তিক আঘাত দিতে আমার কষ্ট হয়। তাই এলো মেলো কাণ্ড করে বুঝিয়ে দিই ও যেন আমার কাছ থেকে কিছু আশা না করে।

এ অন্যায় জয়া। তুই ইচ্ছে করে সাংঘাতিক ভুল করে চলেছিস।

তরুণকে সব কথা খুলে বলিস না কেন?

না, আমার দুর্বলতা ওকে আমি কোনোদিনও জানাতে পারবো না। ও যদি সেকথা বুঝতে পারে তাহলে আমার আশায় বসে থেকে থেকে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুতেই আমাকে পাবে না। তার চেয়ে ও অন্য কাউকে বিয়ে করলে সব পাবে—সুখী হবে।

শীলা ভেবে পেলো না জয়শ্রীকে আর কী বলবে। ঠিক করলো একদিন সময় মতো তরুণকে সব খুলে বলবে। ও বুদ্ধিমান ছেলে। হয়তো একটা কিছু করে জয়শ্রীর সব যন্ত্রণা দূর করে দিতে পারবে। তার জন্যে আজ দুঃখ হ'লো শীলার। জয়শ্রীকে ভুল সন্দেহ করেছিলো বলে লজ্জা পেলো। তার মুখ থেকে একথা শুনে আজ সে অবাক হয়ে গেছে। এমন করে কোনোদিন শীলা সব কথা ভেবে দেখেনি। জয়শ্রীর ওপর এতোদিন সে অবিচার করে এসেছে। সত্যি, তার চেয়ে শীলা তো অনেক ভালো আছে।

জয়শ্রী বললো, কতো বয়স হয়েছে আমার? কী দেখেছি আমি জীবনের? আমার কি অন্য সকলের মতো সাধ আহ্লাদ করতে ইচ্ছে হয় না? কিন্তু কী করবো বল? ইচ্ছে থাকলেও কিছুই আমার করবার উপায় নেই। তাই যখন যে ডাকে তার সংগে যাই, একটু চুপ করে থেকে

জয়শ্রী আবার বললো, একজনের সংগে বেশি মিশতে চাই না, একজনের সংগে বন্ধুত্ব করতে চাই না, তাহ'লেই মায়া পড়ে যাবার সম্ভাবনা। সেটা দু'জনের পক্ষেই সমান কষ্টকর। তাই দশজনের সংগে মিশি।

শীলা আর কথা বাড়ালো না। বাড়ি ফেরবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো: জয়শ্রী হঠাৎ বড়ো বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে যেন। নিঃশব্দে সে শীলাকে বাসে তুলে দিলো।

বাসে বেশি লোক নেই। শীতের কঠিন হাওয়ায় চারপাশ কাঁপছে। হঠাৎ তার বুকও কেঁপে উঠলো। ভীষণ ভয় লাগলো তার। জয়শ্রীর বাড়িতে বসে শীলার মনে হয়েছিলো সে তার চেয়ে অনেক ভালো আছে। কিন্তু সেই প্রায় শূন্য বাসে শীলা নিজেকে অন্যভাবে দেখলো। মনে হলো জয়শ্রীর সংগে তার কোনোই প্রভেদ নেই। দু'জনেরই এক অবস্থা। কেমন করে বিয়ে করবে শীলা? সে যদি বাড়ি ছেড়ে যায় তাহলে তাদেরও সংসারে অভাব আবার বেড়ে যাবে, বাবার আবার কষ্ট হবে, অশান্তির ছায়া পড়বে দেয়ালে দেয়ালে।

হঠাৎ বিকাশের ওপর যতো জমা রাগ পড়ে গেল শীলার। ভাবলো সব কিছু ভালোর জন্যেই ঘটে। বিকাশের কৃপা নিয়ে বাঁচবার কল্পনা আজ আর সে করতে পারে না। সে জানে বিকাশ ফিরে এলে তাদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি হবে না। আবার সেই টাকা পয়সার কথা উঠবে। এখন সে সব কথা শুনলে লজ্জা করবে শীলার। নিজেদের দৈন্য কারোরি কাছেই সে আর প্রকাশ করতে পারবে না—তা' সে যেই হোক না কেন। বিকাশের সংগে তার আকাশ পাতাল তফাৎ। সে বাড়িতে কিছুতেই ছোটো হয়ে থাকতে পারবে না শীলা। প্রতিকূল অবস্থায় সে নিজেকে অনায়াসেই মানিয়ে নিতে পারে—কিন্তু বিকাশ তাকে যতোই ভালোবাসুক, ভবিষ্যতে একদিন তার নিশ্চয়ই মনে হবে সে তাকে

দয়া করেছে। তখন কোথায় যাবে শীলা! না, মা বাবাকে ছেড়ে, সংসারে অভাব বাড়িয়ে সে কখনও কোথাও যাবে না। জয়শ্রীর মতো তারও যাবার উপায় নেই।

প্রথম দর্শনেই নীলিমাকে শীলার ভালো লেগেছিলো। তার সম্বন্ধে আপিসের অনেকে যা-ই বলুক না কেন, শীলার সে সব কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হতো না। শুধু সেক্রেটারি অবিনাশ বাবু নয়, এমন সুন্দর চেহারা নীলিমার যে তাকে যে দেখে সে-ই অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও। মাঝে মাঝে শীলা নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নানা কথা ভাবে। এই আপিসে এমন চাকরি করা সাজেনা তার। কেন তাহলে চাকরি করে নীলিমা? ওর সংসারে কি অভাব আছে? ওর স্বামী কেমন! নীলিমার সব খবর জানতে ইচ্ছে করে শীলার। কিন্তু তার সংগে ঘনিষ্ঠতা করবার সুযোগ হয়না কিছুতেই।

অবিনাশবাবুর সংগে নীলিমার বন্ধুত্ব যে একটু বেশি মাত্রায় হয়েছে তা শীলারও চোখে পড়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সে খারাপ কিছু দেখতে পায়না। তার শিক্ষাই তেমন নয়। বরং সে নীলিমাকে সহানুভূতি দিয়ে বিচার করে। আর তাকে সহজ ও উদার বলে মনে হয়। অমন রূপ নিয়ে চাকরি করতে হচ্ছে বলে তার মুখে বিরক্তির চিহ্ন মাত্র নেই। অবস্থা বুঝে যারা সর্বত্র মানিয়ে নিতে পারে তাদের শীলা শ্রদ্ধা করে। নীলিমা খুব সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে, কাজের খাতিরে অবিনাশবাবুর সংগেও সহজে মিশে যেতে পেরেছে। তাদের বন্ধুত্ব হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। আজ নীলিমা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হ'তো

তাহলে তো কোন কথা বলতোনা কেউ। আপিসে নীলিমার সংগে দেখা হলেই শীলা এসব কথা ভাবে। আর তার সব খবর জানবার আগ্রহে অধীর হয়ে পড়ে।

একদিন হঠাৎ নীলিমা শীলাকে ডেকে পাঠিয়ে বললো, তুমি যে কমলেশবাবুর মেয়ে সে কথাতো আমাকে বলনি শীলা ?

লজ্জা পেয়ে শীলা বললো, আপনি বাবাকে চেনেন ?

নীলিমা হাসলো, আমার সংগে আলাপ নেই কিন্তু নামে তাকে না চেনে কে ? ওঁর মতো লেখক ক'জন আছে !

একদিন আমাদের বাড়ি যাবেন নীলিমাদি ? শীলা ফস্ করে বলে বসলো।

নিশ্চয়ই যাবো, তারপর দু'চার মিনিট চুপ করে থেকে নীলিমা বললো, আমারও এককালে লেখবার খুব সখ ছিলো কিন্তু শেষ অবধি আর হলোনা—

আস্তে আস্তে শীলা বললো, আপনার চেহারা দেখে কী জানি কেন আমার সে কথা মনে হয়েছিলো।

খুশি হয়ে নীলিমা বললো, বলো কী! সত্যি ? আমার চেহারার কোথায়ও কি এখনও ওসবের ছাপ আছে ?

আছে নীলিমাদি, মাথা তুলে শীলা বললো।

অকস্মাৎ এমনি করেই নীলিমার সংগে শীলার অন্তরংগতা হলো। তারপর ওদের রোজ দেখা হয়, রোজ কথা হয়। নীলিমা মাঝে মাঝে শীলাদের বাড়িতে আসে শীলাও প্রায় নীলিমার বাড়ি যায়। কমলেশের সংগে অনেকক্ষণ আলোচনা করে নীলিমা। তার কথা শুনতে শুনতে কমলেশ অবাক হয়ে যায়।

নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার মতো উন্নত মনের

মেয়ে আমি কখনও দেখিনি।

কমলেশের কথা শুনে শীলাও হেসে বলে, ওঁর মতো রূপ আমিও কখনও দেখিনি বাবা।

কমলেশের কথা শুনে মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবে নীলিমা। তাকে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে তার, সে যেন সাহায্য চায়, তার কাছে সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার শক্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারেনা। তেমনি মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকে। ভাবে আজ নয়, অন্য কোনোদিন কথা হবে।

নীলিমার সংগে কমলেশ যতো কথা বলে ততো কথা বোধ হয় সে খুব কম লোকের সংগে বলেছে। কথাবার্তা শুনে মনে হয় পড়াশুনোয় ভালো ছিল নীলিমা। কিন্তু পড়াশুনোয় তো অনেকেই ভালো থাকে, তারা তো এমন যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করতে পারেনা। নানা প্রতিকূল অবস্থায়ও সত্যকে স্বীকার করতে পারেনা।

নীলিমা হয়তো আজও কোনো বিদ্রোহ করবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু কমলেশ স্পষ্ট বুঝতে পারে প্রয়োজন হলে সে সব কিছু করতে পারে। এই পৃথিবীতে এক ধরনের লোক আছে যারা অন্যায় সহ্য করে, আর পাঁচ জনের ভয়ে বিপুল মিথ্যায় নিজেকে মানিয়ে নেয়। বিশেষ করে মেয়েরা যাদের ব্যক্তিত্ব আছে, তারাও সহসা সাহস পায়না মিথ্যার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবার। যে পারে সে অনন্যা।

নীলিমা কখনও কাউকে গায়ে পড়ে নিজের কথা বলে না। কমলেশকে সে ইচ্ছে করে কিছুই বলেনি কিন্তু কথায় কথায় হয়তো তার অজ্ঞাতে এমন কিছু বেরিয়ে পড়েছে যাতে কমলেশ বুঝতে পেরেছে কোথায় তার জ্বালা।

সারাদিন রাত একটা তীব্র জ্বালা বুকে বয়ে ঘুরে বেড়ায় নীলিমা। সে কাউকে কিছু বলতে পারে না, কেননা বলবার কিছু নেই। সে জানে

একটি লোকও তাকে সহানুভূতি দেখাবেনা, তার কথা বুঝতে পারবেনা কেউ।

তাতে ক্ষতি নেই নীলিমার। সে কারোর সহানুভূতির কাঙাল নয়, সে কারোর সাহায্য চায়না। তার মনে হয় তার মেরুদণ্ডে এখনও জোর আছে, যা করবার সে একাই করবে।

কিন্তু কী করবে সে? কী আছে তাঁর করবার? নিজের মংগলের কথা ভেবে সে যা করেছে তাতে কারোর সমর্থন ছিলনা। তাই আজ সে যদি তার পাওনা পরিপূর্ণ রূপে না পায় তাহলে কাউকে নিজের লোকসানের কথা জানিয়ে লাভ নেই—কেউ তার কথা বুঝতে পারবেনা।

শুধু যে নীলিমা পড়াশুনোয় ভাল ছিলো তা নয়, আরও গুণ ছিলো তার। সে সুন্দর ইংরেজী বলতে পারতো, খুব ভালো বাংলা লিখতে পারতো। তাছাড়া সূক্ষ্ম রুচি জ্ঞান আর অদ্ভুত মনের জোর ছিলো তার। আজ তার রুচিতে আঘাত লেগেছে, কিন্তু মনের জোর এতটুকু কমেনি। যদি কমতো তাহলে চলে ফিরে বেড়াতে পারতো না নীলিমা। মনের জোর নীলিমার সবচেয়ে বড়ো সম্বল।

অতীতের কথা ভেবে দেনাপাওনার হিসেব করতে করতে সবচেয়ে আগে নীলিমার মনে হয় কতো তাড়াতাড়ি দিনগুলি কেটে গেল। পড়াশুনো শেষ করবার সংগে সংগে সে যে হঠাৎ বিয়ে করে ফেলবে তা সে নিজেও কখনও ভাবেনি। আলাপের প্রথম দিনই জয়ন্তকে তার ভালো লেগেছিল। কেন ভালো লেগেছিল সে কথা আজ পর্যন্ত জানেনা নীলিমা। জীবনের কোন কিছু নিয়ে চুলচেরা হিসেব নিকেশ করতে প্রবৃত্তি হয়না তার। আজ তাকে বাধ্য হয়ে একথা ভাবতে হয় কেননা আর তার দিন চলেনা।

জয়ন্তর কোন দোষ নেই! কিন্তু তার ওপর কোন মেয়ে নির্ভর করতে পারেনা। অবশ্য আজকের মতো এমনি করে তার ওপর কোনোদিনই

নির্ভর করতে চায়নি নীলিমা। কারোর ওপর নির্ভর করা তার স্বভাব নয়। যেদিন সে জয়ন্তকে প্রথম ভালোবেসেছিল সেদিন হয়তো তার মধ্যে সে যৌবনের আশ্চর্য প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলো। ছেলেমানুষী, দুরন্তপনা ধৈর্যের অভাব, সব কিছু তুচ্ছ করবার অদম্য উৎসাহ সেদিন নীলিমার ভালো লেগেছিলো। জয়ন্ত কিছুই করতোনা তখন। সবে সে কলেজ থেকে বেরিয়েছিলো। এক ছেলে সে। মা মারা যান ছেলেবেলায়, বাবা মারা গেছেন কিছু দিন আগে। কিন্তু ছেলের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা তিনি ভালো করে গেছেন। একটু বুঝে চললে সারা জীবন তার অর্থের অভাব হবেনা।

কিন্তু আজও বুঝে চলতে পারলো না জয়ন্ত। সে শুধু স্বপ্ন দেখে, শুধু কল্পনা করে। চাকরি সে করবেনা, করতে পারেনা। নানা রকম ব্যবসার পরিকল্পনায় সে দিনরাত বিভোর হয়ে থাকে। কিন্তু আজ নীলিমা বুঝতে পেরেছে ব্যবসা করতে গেলে যে গুণগুলি থাকা দরকার তার একটিও জয়ন্তর নেই। লোকের কথায় সে মেতে ওঠে, যে যা বোঝায় তাই বোঝে। আর পাঁচজনকে প্রতাপ দেখাবার জন্যে সামর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় করে।

বিয়ের পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়ে গেল। তবু নীলিমার কাছে সে কথা ভাঙলো না জয়ন্ত। বললো, এবার আর দেখতে হবেনা লাখ কয়েক টাকা এসে গেল বলে—

একদিন নীলিমা এসব কথা বিশ্বাস করতো—লাখ টাকার আশায় বসে থাকতো। কিন্তু আজ তার ভুল ভেঙে গেছে। জয়ন্তর সে ছেলে-মানুষী দেখে একদিন সে মুগ্ধ হয়েছিলো আজ তা তার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। শুধু কথা আর কল্পনা—আর কিছু নয়।

তাই আর চুপ করে থাকেনা সে। জয়ন্তর কথা শেষ হবার সংগে সংগে

বলে ওঠে, শোনো এবার একটা চাকরি দেখে নাও, অনেক দিন তো ব্যবসা করলে—

চাকরি? তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে নীলিমার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললো, আমি চাকরি করবো?

কেন করবেনা?

তুমি কী বলছো নীলিমা? গোলামী করা কি আমার পোষায়?

উপায় কী ব্যবসা করে-তো সব টাকা নষ্ট করলে এখন চাকরি না করলে চলবে কেমন করে?

চাকরি করে সারা জীবনে লোক যা পায় আমি রাতারাতি তাই পাবো—

কিন্তু সব টাকা-তো প্রায় শেষ করে ফেললে—

কে বললো? বাধা দিয়ে জয়ন্ত বলে, ব্যবসায় টাকা খাটছে। এখন সময়টা একটু খারাপ যাচ্ছে বলে সামান্য অসুবিধা হচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যে আমার টাকা উপচে পড়বে দেখো।

আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না নীলিমার। এমন মানুষের সংগে কথা বলে কী লাভ! এই ভেবে তার দুঃখ হয় কেন জয়ন্ত তাকে শুধু কথা বলে ভুলিয়ে রাখে। সে তো বুঝতে পেরেছে তার সামর্থ কতোখানি। তবু কেন সে তাকে ছলনা করে! কেন সত্যি কথা বলে সরল বিশ্বাসে কাছে এগিয়ে আসে না—বৃথা আশা দিয়ে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে দেয়?

আজ নীলিমা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সতর্ক হবার এখনও সময় আছে। এখন থেকে সাবধান না হলে ভরাডুবি হবে তার। জয়ন্তর ওপর নির্ভর করা চলে না এতোটুকু। না, নির্ভর করতে চায় না নীলিমা।

পাড়ায় পাড়ায় দুঃখ জানিয়ে সহানুভূতি কুড়োবার মেয়ে নয় নীলিমা।

ভাগ্যকে দোষ দিয়ে সে হা হুতাশও করতে চায় না। যা হবার তা হয়েছে—এমন হতোই। এমন না হলে নীলিমা হয়তো এতো ভালো ভাবে নিজেকে জানতে পারতো না। তারও দিন হয়তো শুধু কল্পনা বিলাসেই কেটে যেতো।

ওদিকে দিনে দিনে আরও অনেক উপসর্গ দেখা দিতে লাগলো। মাঝে মাঝে জয়ন্ত দু' তিনদিনের জন্যে কোথায় উধাও হয়ে যায়, বাড়িতে কাবুলী এসে লাঠি ঠোকে, থানা থেকে পুলিশ ইন্সপেক্টার এসে জয়ন্তর খোঁজ নিয়ে যায়।

লজ্জায় মাটিতে মাথা নুয়ে পড়তে চায় নীলিমার। তবু মাথা উঁচু করে সে সকলের সংগে দেখা করে কথা বলে। তারপর তাদের বিদায় করে দেয়। কে দেখলো, পাড়ার লোক কী ভাবলো এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। কিন্তু মনে মনে ভাবে যে আর অপেক্ষা করা নয়, আর একদিনও অপেক্ষা করা চলবে না, এই মুহূর্ত থেকে তাকে নিজের ওপর নির্ভর করতে হবে—নিজের কথা নিজে ভাবতে হবে। তার কেউ নেই, কেউ তার দিকে তাকিয়ে দেখবে না।

তখন প্রথম নীলিমার চাকরি করবার কথা মনে হয়। চাকরি পেতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি তাকে। তার এক কাকার সংগে অবিনাশ বাবুর জানা শোনা ছিলো। তা ছাড়া চাকরি পাবার সব গুণগুলিই নীলিমার ছিলো। বোধ হয় কিছু বেশি ছিলো তার। এখানে না হলেও অন্য কোথাও সহজেই চাকরি হয়ে যেতো তার। চাকরি করতে হবে বলে একটুও দুঃখ নীলিমার হলো না। বরং এতোদিন পর সত্যি নিজের ওপর নিজে নির্ভর করতে পারবে মনে করে আনন্দে মন ভরে গেল। কারোর কথায় বিশ্বাস করে এখন থেকে আর তাকে বারবার হতাশ হতে হবে না।

তবু জয়ন্তকে একবার একথা জানানো দরকার। তার স্বভাব জানে

নীলিমা। খবর শুনে হয় তো সে রেগে উঠবে। নীলিমাকে চাকরি করতে দিতে রাজি হবে না কিছুতেই। যাদের আর কিছু থাকে না তাদের দম্ভ থাকে। দম্ভে আঘাত লাগবে জয়ন্তর। হাসি পেলো নীলিমার। আজকাল জয়ন্তর কথা শুনলে তার হাসি পায়।

শোনো, স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে একটু থামলো নীলিমা।

জয়ন্ত তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধছিলো। বোধহয় বেরোবার তাড়া ছিলো তার। নীলিমা সংসার খরচের টাকার কথা তুলবে মনে করে সে তার কথা শোনবার আগেই ব্যস্ত হয়ে বললো, আর দু' একদিন, গাড়ি আমি দেখে রেখেছি, হেসে জয়ন্ত বললো, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যানগার্ড চালিয়ে তোমাকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবো। মাড়োয়ারীরা সর্বনাশ করে দিলো, তা না হলে আজ আমার টাকা খায় কে!

নীলিমা বললো, আমি কাল থেকে চাকরি করতে যাচ্ছি।

শুধু কয়েকটি কাটা কাটা কথা। কিন্তু তা শুনে জয়ন্তর মনে হলো ঘরে যেন বাজ পড়লো। টাই বাঁধা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কী বললে?

আবার বললো নীলিমা, এক মাড়োয়ারী ফার্মে একটা চাকরি ঠিক করেছি। চাকরিটা খারাপ নয়—

নীলিমা ভেবেছিলো রাগে জয়ন্ত চিৎকার করে উঠবে। তার হাত ধরে বলবে, না কিছুতেই তুমি চাকরি করতে যাবে—

কিন্তু আশ্চর্য! একটুও লাফালাফি করলো না সে। বরং মনে হলো নীলিমার কথা শুনে সে যেন কিসের আশ্বাস পেলো। উত্তেজনার ছায়া মিলিয়ে গেল তার মুখ থেকে।

সে শান্ত স্বরে বললো, তুমি কেন চাকরি করবে নীলিমা? এতোদিন

যখন কষ্ট করলে তখন আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলেই তো পারতে—

নীলিমা হেসে বললো, কষ্টের কথা তুমি দয়া করে তুলোনা। বেশতো কয়েকদিন পর আমি নাহয় চাকরি ছেড়ে দেবো। কাজের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকনা, ক্ষতি কী ?

না না, মানে এই আর কী, আর কথা না বাড়িয়ে টাই বাঁধা শেষ করে জয়ন্ত বেরিয়ে গেল।

ভাগ্যিস স্বামীর কথার ওপর নির্ভর করে সেই কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেনি নীলিমা। তাহলে শুধু শুধু অকারণে আবার তাকে হতাশ হতে হতো।

তবু যাহোক আনন্দে না থাকলে নীলিমার মনে শান্তি থাকতো যদি জয়ন্ত সামান্য সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতো। নীলিমা বুঝতে পারে তার চাকরি করায় সে মনে মনে খুশি হয়েছে কিন্তু মুখে এখনও জয়ন্ত বলে যায়, কী দরকার তোমার কষ্ট করে চাকরি করবার ? আমি শিগগিরই এটা করবো, ওটা করবো ইত্যাদি। তার ওপর আজকাল প্রায়ই নীলিমার কাছ থেকে সে হাত পেতে টাকা নেয়। নেবার সময় হেসে বলে, কাল দিয়ে দেবো। কিন্তু সে-টাকা আর ফিরিয়ে দেয়না জয়ন্ত। নীলিমা জানে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই। তবু কেন সে মিথ্যা কথা বলে তার কাছে। একবার নয়, দুবার নয় প্রায়ই সেই এক-ভাষায় টাকা চাইতে লাগলো জয়ন্ত, ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলো। কিন্তু আর ফিরিয়ে দিলোনা। তারপর একদিন বিরক্ত হয়ে টাকা দেওয়া বন্ধ করলো নীলিমা। কারণ তা না করে তার উপায় ছিলোনা। সে চাকরি করছে সংসার বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। জয়ন্তর খেয়ালকে প্রশ্রয় দেবার জন্যে নয়।

নীলিমার কাছ থেকে টাকা না পেয়ে জয়ন্ত অন্য মূর্তি ধরলো। যে অক্ষম তার আস্ফালন বেশি। তাই সময়ে অসময়ে সে নীলিমাকে আক্রমণ করতে লাগলো। আগে তর্ক করতো নীলিমা, আজকাল স্বামীর সংগে কথা বলতে তার প্রবৃত্তি হয়না।

জয়ন্ত বলে, লোকে তোমার সম্পর্কে নানা কথা বলছে, তুমি নাকি তোমার আপিসের লোকদের সংগে ফ্লার্ট করে বেড়াও। চাকরি তোমাকে ছাড়তে হবে নীলিমা—

কারা কী বলছে? তোমার বন্ধুবান্ধব?

হ্যাঁ।

তোমার সম্পর্কেও লোকে আমাকে নানা কথা বলে। লোকের কথায় ওঠা বসা আমার স্বভাব নয়।

জয়ন্ত ব্যাঙ্গের সুরে বলে, চাকরিটা ছেড়ে দিলেই তো হয়—

হঠাৎ জ্বলে ওঠে নীলিমা, কোন ভরসায় চাকরি ছাড়বো বলতে পারো?

কেন? তুমি কি ভাবো তুমি চাকরি না করলে সংসার চলবে না?

না।

এতোদিন কি চলতোনা?

চলতো না। আমি জোর করে চালিয়েছি। কিন্তু অসম্মানের মধ্যে আমি আর থাকতে চাইনা—থাকতে পারবোনা বলে চাকরি নিয়েছি। তুমি দয়া করে আমাকে হুকুম করতে এসোনা। যদি জোর করে অধিকার খাটাতে চাও তাহলে সব কিছু ফেলে এ-সংসার ছেড়ে চলে যাবো।

এরপর অন্য রূপ নিলো জয়ন্ত। সে যেন নিঃস্ব রিক্ত। আজ তার টাকা নেই বলে কেউ দেখেনা। এ সংসারে টাকা দেখে সব কিছুর মূল্য বিচার করা হয়। আর বেশিদিন বাঁচবেনা জয়ন্ত। কঠিন অসুখ হবে তার শিগগির। তখন তাকে দেখা শোনা করবার একটি লোকও থাকবেনা

—কেউ এগিয়ে এসে তার মুখের কাছে এক গ্লাশ জলও এগিয়ে দেবেনা। কারণ তার টাকা নেই। আত্মহত্যা করে মরে যাবে জয়ন্ত। তখন বেঁচে যাবে নীলিমা। যার টাকা নেই তার এ সংসারে বেঁচে থেকে কী লাভ! জয়ন্তর আয়ু শেষ হয়ে এলো।

আজকাল নীলিমাকে দেখলেই এমনি অবান্তর কথা সে বলে যায়। শুধু তাকে একা নয়—বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, প্রত্যেককে এসব কথা বলে বেড়ায় সে। না বললেও চলে, সকলে নীলিমাকে দোষ দেয়, সে নাকি স্বার্থপর। সে শুধু নিজের কথা ভাবে, অন্য কারোর কথা ভাবেনা।

যার যা খুশি বলুক, কারোর কথা নীলিমা গ্রাহ্য করেনা। কেমন করে সে লোককে বোঝাবে কোথায় তার হার হয়েছে, কোথায় তার আঘাত লেগেছে। তাই সে কারোর সংগে কোনো কথা বলেনা।

কিন্তু আজকাল এ সংসারে থাকতে আর ভালো লাগেনা তার। অন্য কোথাও গিয়ে একেবারে একা থাকতে ইচ্ছে করে। এখানে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেখানে শান্তি নেই, আনন্দ নেই, প্রাণের টান নেই, সেখানে তার মতো মেয়ে থাকবে কেমন করে! নীলিমার কোথাও এতোটুকু ভান নেই। নিজেকে ফাঁকি দিয়ে সে আর পাঁচজনকে ভুলিয়ে রাখতে চায়না। নিজে বঞ্চিত বলে কাজের মধ্যে সে সব কিছু ভুলে থাকবার চেষ্টা করে। বাইরে থেকে যা কিছু পায় তা গ্রহণ করে অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করবার চেষ্টা করে। তাই আপিসে নিজেকে কাজের মানুষ বলে নীলিমা প্রমাণ করতে পেরেছে।

তবু যতোক্ষণ বাইরে থাকে ততোক্ষণ সে নিজেকে একেবারে ভুলে থাকে। শূন্যতা পীড়াদায়ক হয়ে ওঠেনা তার কাছে। কিন্তু ঘুরে ফিরে এলেই তার নিজেকে যন্ত্রের মতো মনে হয়। কোথায় তার ঘর? এ কোথায় এলো সে?

ঘর ভেঙে গেছে নীলিমার। ঘর হলো মানুষের নিশ্চিত আশ্রয়। কিন্তু এঘরে নিশ্চিত হতে পারেনা নীলিমা। কোন দেয়ালে ঠেস দিয়ে শান্তি পাবে সে? কার ওপর নির্ভর করবে? যার ওপর নির্ভর করা যায়না তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করা যায়, কৃপা করা যায়, সহানুভূতি দেখানো যায়, কিন্তু স্বামী বলে ভালোবাসা যায় না।

নীলিমা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ অবধি সে কিছুতেই জয়ন্তকে ভালোবাসতে পারলোনা। আর কোনোদিনও তার কোন কথায় বিশ্বাস করতে পারবে না সে, কিছুতেই নির্ভর করতে পারবে না। অন্য কোনো মেয়ে হলে হয়তো মানিয়ে নিতো, লোকের ভয়ে বিরাট ভান করে সে হয়তো কাটিয়ে দিতে পারতো সারা জীবন। নীলিমা কিছুতেই তা পারবেনা। কিন্তু সে জানেনা কী করবে। তবে এটা ঠিক যে এমন করে আর বেশিদিন চলতে হলে সে তিল তিল করে শুকিয়ে মরে যাবে।

নীলিমার মনের অবস্থা যখন এমন তখন সে এলো কমলেশের সংগে আলাপ করতে। তার সংগে কথা বলতে বলতে সে যেন অন্য জগতের সন্ধান পেলো। এতো সুন্দর কথা বলে কমলেশ যে নিজের দুঃখকে আর দুঃখ বলে মনে হয়না, ব্যর্থতার জ্বালাও কোথায় মিলিয়ে যায়! সত্যিই আনন্দ হয় কমলেশের সংগে কথা বলে।

নিজের ব্যর্থতার ইতিহাস নীলিমা কাউকে কোনোদিন মুখ ফুটে জানায়নি, জানাবার প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু কমলেশের সংগে কথা বলতে বলতে তার তাকে সব কথা বলতে ইচ্ছে করে আর মনে হয় হয়তো সে তাকে সব সহ্য করবার অসীম ধৈর্যের মন্ত্র বলে দিতে পারে। কিন্তু আজ কাল করে করে শেষ অবধি কমলেশকে সে আর কিছু বলতে পারেনা। ভাবে, বলবো এখন একদিন।

সুলতা আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে। সে যেন সংসারে থেকেও নেই। কিছুই আর ভাল লাগেনা তার। সব সাধ ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন মরতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। কী হবে এ সংসারে বেঁচে থেকে! কথায় কথায় নীলিমার সামনে সুলতা এমনি উক্তি করে বসে।

নীলিমা তাকে বাধা দিয়ে বলে, ও কী কথা দিদি, আপনি চলে গেলে ওঁকে দেখবে কে?

বিরক্ত হয়ে সুলতা বলে, আমি তার কী জানি! উনি কোনোদিন আমার কথা ভেবেছেন?

নিশ্চই ভেবেছেন, সব সময় উনি ভাবেন।

আরও বিরক্ত হয়ে সুলতা বলে, দুদিন আলাপ করে তুমি সব জেনে ফেলেছো দেখছি। দূর থেকে অমন কথা শুনতে প্রথম প্রথম সকলেরই ভালো লাগে. একটু থেমে সুলতা বলে, আমারও একদিন ওসব কথা শুনতে ভালো লাগতো—

হেসে নীলিমা বলে, বাইরের আর পাঁচজনওতো ওঁর কথা শুনতে ভালোবাসে!

তারা কেউ ওঁর সংগে ঘর করেনা, তাহলে বুঝতো শুধু কথায় কাজ চলেনা।

না চলুক, ওঁর জন্যে একটু কষ্ট সহ্য করতে ক্ষতি কী? উনি একটা বড়ো কাজ নিয়ে মেতে আছেন। আমাদের উচিত উনি যেন সে কাজ আরও ভালোভাবে করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা—

তোমাদের যা খুশি তোমরা তাই কর, আমি এ সংসার ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই—

নীলিমা আবার হেসে বলে, কী যে বলেন! শক্তি চলে গেলে শিবের আর রইলো কী!

খুব অল্পদিন নীলিমা দেখেছে কমলেশকে। কিন্তু মানুষ হিসেবে এর মধ্যেই তাকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। কমলেশকে তার যথার্থ পুরুষ বলে মনে হয়। এতোটুকু সংকীর্ণতা তার মনের কোথাও নেই। এমন মানুষ যদি পার্থিব কিছু না দেয় তবু তার এই না-দেওয়াটাই নীলিমার মতো মেয়ের কাছে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। যৌবনের দাবীতে এমন মানুষকে শুধু উগ্র প্রেম দিয়েই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়না—মায়ের মতো স্নেহ দিয়েও আগলে রাখতে হয়। কিন্তু এতো কথা কেন মনে আসে নীলিমার!

কথায় কথায় একদিন নীলিমা কমলেশকে বললো, আমি এসে শুধু শুধু আপনার অনেক সময় নষ্ট করে দিয়ে যাই—

না, নীলিমা, কমলেশ হেসে বললো, তোমার সংগে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে—

আপনার সংগে আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনা কথাগুলি আপনি কেমনভাবে গ্রহণ করবেন!

নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে কমলেশ বললো, তোমার যা খুশি বল, আমি যা বোঝবার ঠিক বুঝে নেবো।

নীলিমা কিছু না বললেও কমলেশ বুঝেছিলো একটা চাপা অশান্তিতে তার মন ভরে আছে। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করতো নীলিমাকে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু ঠিক কেমন ভাবে প্রশ্ন করবে সে কথা ভেবে পায়নি কমলেশ।

সেদিন নীলিমা তাকে কিছু বলতে পারলোনা। অন্য আর একদিন মন খুলে বললো সব কথা। বললো, আমাকে হয়তো আর পাঁচজন স্বার্থপর বলবে। কিন্তু যেখানে বিশ্বাস নেই, প্রাণের টান নেই

সেখানে আমি থাকবো কেমন করে ?

একটু ভেবে নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে কমলেশ বললো, না নীলিমা যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে তোমার মতো মেয়ে কিছুতেই থাকতে পারবেনা। এ হলো তোমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি এক কথায় তোমাকে কী বলবো বুঝতে পারছিনা—

নীলিমা বললো, কারোর বলবার কিছু নেই আমি জানি, কী ভেবে সে বললো, হয়তো আমি আর বেশিদিন জয়ন্তর সংগে থাকতে পারবোনা।

ওকথা সহজে ভাবতে হয়না নীলিমা। ভাঙা সহজ কিন্তু গড়া কঠিন। মেয়েরা প্রথমে গড়ার স্বপ্ন দেখে।

আমিও অনেক দিন গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু আমার সব কিছু ও ভেঙে দিয়েছে।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে কমলেশ বললো, আমি সব সময় যেকথা ভাবি তা আজ তোমাকেও বলি, প্রতিকূল অবস্থায় মানিয়ে নিয়ে যে দিন চালিয়ে দেয় নিঃসন্দেহে তার ধৈর্য্য অসীম। কিন্তু সকলে তা পারে না। চিরকাল যারা অন্যাযের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে তাদের ব্যক্তিত্ব প্রখর। ব্যক্তিত্ব না থাকলে কেউ সংগ্রাম করতে পারে না।

কমলেশের মুখ থেকে বোধহয় নীলিমা এমন কথা শুনতে চেয়েছিলো। সে জানে সাধারণ লোক তার দুঃখ বুঝতে পারবে না। তারা বলবে এমন কল্পনা করাও পাপ। কমলেশও যদি না বুঝতো তাহলে ক্ষতি ছিলো না, নীলিমা শুধু তাকে তার সব কথা জানাতে চেয়েছিলো। আলাপের প্রথম দিনে কমলেশকে তার বড়ো আপনার মনে হয়েছিলো।

বস্তুত ঘরে কোনো আকর্ষণ না থাকায় নীলিমা বাইরে অবলম্বন খুঁজেছিলো। না, কারোর ওপর নির্ভর করবার ইচ্ছে তার আর নেই।

কিন্তু সজোরে কারোর হাত ধরে সে শুধু ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলতে চেয়েছিলো, তা সে যেই হোক না কেন।

আপিসে চাকরি পাবার পর সে অবিনাশ বাবুর ব্যক্তিত্ব দেখে অবাক হয়। তার দায়িত্ব জ্ঞান তাকে মুগ্ধ করে। আগে তার দিকে তাকিয়ে থেকে নীলিমা ভাবতো, জয়ন্ত এমন হলো না কেন। কিন্তু অবিনাশ বাবু কাজের মানুষ, তাঁর সংগে শুধু কাজের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলা চলে না। সে হলো তার কর্মের সংগী। কিন্তু অভিমানে শুধু বাইরের কাজ নিয়ে মেতে থাকলে নিজেকে যন্ত্রের মতো মনে হয়। বিশ্রামের জন্যে মন খাঁ খাঁ করে। কিন্তু কোথায় বিশ্রামের সংগী! দিনের পর দিন শুধু কাজের চাকায় ঘুরে মরতে হয় নীলিমাকে। ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলবার অবসর পায়না সে। কমলেশ যেন মূর্ত অবসর। তাকে নীলিমার বলতে ইচ্ছে করে, আপনাকে দেখলে আমার সব ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে যায়।

আর তাই হয়েছে। হঠাৎ যেন নীলিমা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। বুকের ভেতর আর তেমন জ্বালা করে না। প্রতিকূল অবস্থায় সত্যি নিজেকে মানিয়ে নেবার শক্তি অনুভব করে। কী গভীর সমবেদনায় থেকে থেকে জয়ন্তকেও তার ভালো লেগে যায়। মিষ্টি কথা বলে তাকে কাছে ডাকে, আদর করে, তাকে বোধহয় মনে মনে একেবারে ক্ষমা করে ফেলে নীলিমা। কিন্তু সুযোগ বুঝে পরদিনই জয়ন্ত টাকা চায় তার কাছে আবার। আর তখন নীলিমার সারা শরীর রী রী করে ওঠে। সে চিৎকার করে বলে, আমার সামনে থেকে তুমি চলে যাও।

কিন্তু টাকা না নিয়ে জয়ন্ত কিছুতেই যেতে চায়না। নীলিমা অবশেষে বিরক্ত হয়ে তাকে টাকা দেয়। তখন সে চলে যায়—নীলিমার মন থেকেও সংগে সংগে অনেক দূরে সরে যায়।

খুব বেশি শীত পড়েছে এবার কলকাতায়। সারাদিন সারারাত ঠাণ্ডা হাওয়া শরীর কাঁপিয়ে যায়। আপিস থেকে বেরোতে না বেরোতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। শীলা রোজই ভাবে এখানে ওখানে যাবে কিন্তু শেষ অবধি তার কোথাও যাওয়া হয়না, সোজা বাড়ি ফিরে আসে। যেদিন কমলেশের কাছে নীলিমা আসে সেদিন ওরা তিনজন একসংগে বসে গল্প করে। অন্যদিন সে সুলতাকে সাহায্য করে।

সুলতার স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়ছে। অভিযোগ করা সে আজ-কাল অনেক কমিয়ে দিয়েছে, কথাও বেশি বলেনা কারোর সংগে। যা হয় হোক—এমন একটা ভাব নিয়ে সে দিন কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

এ সংসারে কোথায় ছিদ্র সে কথা নীলিমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের বুঝতে খুব বেশি দেরি হয়নি। সে ভাবে যদি তার স্বামী কমলেশের মতো মানুষ হতো তাহলে মুখ বুজে তার জন্যে সব কিছু সে সহ্য করতে পারতো। কিন্তু আর ধৈর্য নেই নীলিমার। ফাটল ধরা সংসার ছেড়ে এবার তাকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। প্রতিকূল পরিবেশে সে খুব সহজে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু জয়ন্তর সংগে বাস করা তার কাছে অপমানকর। নিজের কাছে ছোটো হয়ে চূড়ান্ত অপমানের মধ্যে সে আর কিছুতেই থাকতে পারবেনা। আর একবার মনে হলো কমলেশের সংগে দেখা না হলে হয়তো এতো তাড়াতাড়ি এসব কথা তার মনে আসতো না। কার যে কখন কী মনে হয় কে জানে।

ওদিকে কমলেশেরও ক্লান্তি যেন এক কথায় ঘুচে গেছে। যাক তবু একজন তাকে বোঝে, তাকে মানুষ বলে মূল্য দেয়। নীলিমার কথা কমলেশের অনেক সময় মনে পড়ে। সুলতাকে কখনও সে দোষ দেয়না। তবু তার কথা ভাবলে, শীলাকে দেখলে, সংসারের কথা মনে হলে তার শুধু মাথা ঝিম ঝিম করে—কাগজের ওপর কলম চলতে চায়না কিছুতেই।

সেদিন নীলিমাকে কমলেশ বললো, কাউকে দোষ দিতে ইচ্ছে করেনা। কিন্তু প্রায়ই মনে হয়, কোথায় একটা বিরাট গলদ আছে তা-নাহলে এমন হবে কেন!

নীলিমা কিছু বলবার আগেই সে আবার বললো, এমন হওয়া উচিত ছিলোনা, এমন অবিচার সহ্য করাও উচিত নয় তবু সহ্য করতে হয়—এইটাই আমার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ।

নীলিমা বললো, কী আপনার দুঃখ কমলেশ বাবু?

কয়েক মুহূর্ত কী ভাবলো কমলেশ, তারপর বললো, আমি শুধু একটি কাজ করতে পারি নীলিমা। কিন্তু সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তা করেও সংসারের প্রয়োজন মেটাতে পারিনা কেন?

নীলিমা বললো, একদিন পারবেন। আপনার মতো মানুষ—যার চরিত্রে কোনো ফাঁকি নেই, এই দৈন্যের মধ্যে কিছুতেই বেশি দিন বাস করতে পারেনা।

শুধু আমার একার কথা ভাবিনা নীলিমা—ভাবতে পারিনা। আর, একটু থেমে কমলেশ বললো, আজকের পৃথিবীতে আমার মতো কতো লোক তাদের নিজের নিজের কাজ করে আমার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। তাদের সকলের দৈন্যের মূল আমি উপড়ে ফেলতে চাই।

আপনি তা নিশ্চয়ই পারবেন, কমলেশের টেবিলের উপর একটা হাত রেখে নীলিমা বললো, আপনার ধৈর্য অসীম, পরের জন্যে আপনি সব কিছু ছেড়েছেন। আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি নিজের দুঃখ ভুলে গেছি।

কমলেশ ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করলো, কী তোমার দুঃখ নীলিমা?

সব পেয়ে কিছু না-পাওয়ার জ্বালা আর ঘর থাকতে ঘর ভেঙে পথে বেরিয়ে আসবার যন্ত্রনায় আমি দিশা হারিয়ে ফেলে-

ছিলাম। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার নিজের দুঃখ তুচ্ছ হয়ে গেছে। আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। আপনি যেমন আদর্শের জন্যে সব তুচ্ছ করেছেন, সব পেয়েও সন্ন্যাসীর মতো নিরাসক্ত থাকতে পেরেছেন, আমিও তেমনি সত্যের জন্যে লোকনিন্দার ভয় দূর করতে পেরেছি। আমি আর কাউকে ফাঁকি দেবো না—নিজেকেও নয়। জয়ন্তকে আমি মুক্তি দেবো—কথা শেষ করে নীলিমা মুখ নামিয়ে নিলো। কমলেশের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাতে পারলো না।

কমলেশ বললো, তোমার চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছে নীলিমা। আমি জামি তুমি সব সময় ন্যায় কাজই করবে। তাই তোমাকে কোনো উপদেশ দেবো না। শুধু বলি, যাই কর না কেন, সর্বপ্রথম মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নেওয়া দরকার, একটু চুপ করে থেকে কমলেশ বললো, জানো নীলিমা, ভাঙতে সকলেই পারে, কিন্তু গড়া কঠিন। জয়ন্তকে কিছুতেই তুমি কি নতুন করে গড়ে নিতে পারো না ?

কথাটা বলেই কমলেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। একথা না বললেই যেন ভালো হতো। যদি নীলিমা বলে, স্বলতাকে আপনি কি নতুন করে গড়তে পারেন ? তখন কী উত্তর দেবে সে ?

কিন্তু নীলিমা সে কথা বললো না। কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ নিয়ে আপনার কারবার। আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন শুধু অনুরোধ-অনুনয়, মান-অভিমানের মধ্যে দিয়ে কোনো মানুষের চরিত্র বদলে তাকে নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তা করতে হলে হয় নির্মম আঘাত দিতে হয় নয় পরিবেশের আগাগোড়া পরিবর্তন করতে হয়, কথা বলতে বলতে নীলিমার মুখে বেদনার ছায়া নেমে এলো। ম্লান স্বরে সে বললো, আমি জয়ন্তকে ছেড়ে গেলে হয় তো তার উপকারই হবে। এমন ছেলেমানুষের মতো মন নিয়ে সে আর

চলাফেরা করবে না। জানেন তো, যাদের ব্যক্তিত্ব কম, হারানোর অপমান তাদের সব চেয়ে বেশি বাজে। আর সে লজ্জা ঢাকবার জন্যে আজন্ম অকর্ম্মণ্যও হঠাৎ কাজের মানুষ হয়ে ওঠে।

নীলিমার কথা শুনতে শুনতে কমলেশের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে শুধু বললো, তোমার কথাই ঠিক।

নিজের কথা নীলিমা অনেক দিন ধরে ভেবেছে। জয়ন্তকে ছেড়ে না এলে তার আর চলবে না। লোকে তাকে দোষ দিক; পাঁচজন তার নিন্দে করুক—তাতে নীলিমার কিছু যায় আসে না। কমলেশ তার এই বিচ্ছেদ কী ভাবে নেবে শুধু সেকথা ভাবতো নীলিমা। তাই নিজের থেকে তাকে সব কথা বললো সে।

সে জানে আপিসেও তাকে নিয়ে নানা আলোচনা হয়। মুখে কারোর কিছু বলবার সাহস নেই। অনেকের কৌতূহলী দৃষ্টির অর্থ বুঝতে নীলিমার দেরি হয় না।

তাদের কথা সে ধরে না। জীবনকে যারা স্থূল দৃষ্টিতে বিচার করে তাদের পৃথিবীতে নীলিমার মতো মেয়ের কোনো স্থান নেই—সেকথা সে জানে। বিশেষ করে অবিনাশ বাবুর সংগে তার সম্পর্কের কথা নিয়ে আপিসের কর্ম্মচারীরা কী বলাবলি করে সেকথা ভেবে হাসি পায় নীলিমার। তাই প্রতিবাদের কথা কখনও তার মনে হয় না। সে শুধু ভাবে কমলেশ যেন তাকে ভুল না বোঝে—তাহলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হবে।

কমলেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার সেবা করবার জন্যে নীলিমার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। উনি শুধু লিখে যান—রাতের পর রাত—দিনের পর দিন। নীলিমা তাঁর ক্লান্ত হাত থেকে এক সময় কলম টেনে নেবে, তাকে বোঝাবে এখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন। এখন

কমলেশের কিছুদিন বিশ্রাম করা দরকার। সেকথা নীলিমা তাকে বুঝিয়ে না দিলে আর কে বলবে।

অনেকদিন থেকেই শীলা মনে মনে ভাবছে তরুণকে ছুটির পর চা খেতে বলবে। জয়শ্রীও সংগে থাকলে ভালো হতো কিন্তু সে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললো তার সময় হবেনা।

জয়শ্রীকে দেখে অবাক লাগে শীলার। কে তাকে দেখে বলবে যে তরুণের জন্যে তার মনে সামান্য বেদনা বোধ আছে। প্রতিকূল জীবন ধারার সংগে কেমন করে নিজেকে এমন আশ্চর্যভাবে মানিয়ে নিতে পারলো জয়শ্রী! শীলা বোধহয় কোনোদিনও তার মতো সহজ করে জীবনকে .নিতে পারবেনা। মেনে নেবেই বা কেন? বরং চেষ্টা করে, সংগ্রাম করে কঠিন পথ সহজ করে তুলবে। তা হলেই তো বেঁচে থাকা সার্থক হয়ে ওঠে।

আজকাল বিকাশের কথা আর তার তেমন করে মনে পড়েনা। বহু পরিচিতের মধ্যে তাকে একজন বলে মনে হয়। তাকে কৃপা করতে ইচ্ছে হয় শীলার। বড়ো লোকের আদুরে দুলাল। সখ করে কবিতা লেখে। স্থূল দৃষ্টিতে চোখ কান বন্ধ করে চারপাশে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়। জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার সাধ্য নেই—সমবেদনা নিয়ে কারোর কোনো সমস্যা সমাধান করবার ক্ষমতা নেই। বিকাশের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ে শীলার। আর কমলেশকে তার মহাপুরুষ বলে মনে হয়।

তবু শীলা ভেবেছিল বিকাশ তাকে অন্তত চিঠি লিখবে। কোনো উচ্ছাস কি আগ্রহ প্রকাশ না করুক, ভদ্রতার খাতিরে মাঝে মাঝে তার খবর নেবে। তাও করলোনা সে। খুব বেঁচে গেছে শীলা। ছেলেমানুষীর

দিন কেটে গেছে। এমন মানুষের সংগে বিয়ে হলে শীলা হয়তো পৃথিবীর আর কোনো খবর জানবার অবকাশ পেতোনা। শুধু দামী সাড়ি পরে খোঁপায় ফুল গুঁজে কেমন করে আরও আধুনিক কায়দায় ঘর সাজানো যায় শুধু সেই কথাটাই ভাবতো। আর মার্কেট ঘুরে ইংরেজী ছবি দেখে মোটরে বাড়ি ফিরতো। জয়শ্রীর মতো মেয়ের কথা সে জানতে পারতো না, খবর পেতোনা তরুণের মতো কোনো ছেলের—তাদের জন্যে কোনো অনুভব করতে পারতো না শীলা। সে যেন চোরের মতো বিকাশের সংগে অন্য আর এক রাজ্যে পালিয়ে যেতো। ঠোঁট টিপে শীলা আপন মনেই হাসলো। ভালোই হয়েছে তার জীবন থেকে বিকাশ আপনি সরে গেছে। তা নাহলে এক বিশ্রী রকম দ্বন্দ্ব শীলার জীবনের শুরুতেই তার সব কিছু আচ্ছন্ন করে দিতো।

মাসের প্রথমে মাইনে পেয়ে টিফিনের সময় তরুণকে একধারে পেয়ে শীলা জিজ্ঞেস করলো, আজ বিকেলে কিছু কাজ আছে আপনার?

না, কেন বলুন তো?

শীলা হেসে বললো তাহলে আমার নেমন্তন্ন গ্রহণ করুন। চলুন আজ ছুটির পর একসংগে কোথাও চা খাওয়া যাক?

বেশ বেশ, অন্তরংগতার সহজ সুরে তরুণ বললো, হাজার কাজ থাকলেও আপনার নেমন্তন্ন পেলে আমি সব নাকচ করে দিতাম—

শীলা বললো, জয়শ্রীকেও বলবো ভেবেছিলাম—

বাধা দিয়ে তরুণ হেসে বললো, না বলে ভালো করেছেন, বললেও সে বোধ হয় আসতো না।

শীলা মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বললো, আপনি ওর মনের কথা সব বুঝতে পারেন দেখছি।

তরুণ শুধু বললো, হ্যাঁ পারি, একটু থেমে ও আবার বললো, না

বুঝতে পারলেই আমার পক্ষে ভালো হতো।

তরুণের কথার অর্থ শীলা কি বুঝলো কে জানে। সে কিছু না বলে চুপ করে রইলো।

সেইদিন বিকেলে চৌরঙ্গীর কোনো এক নির্জন রেস্তোরাঁর কেবিনে বসে তরুণের সংগে শীলার আবার কথা হলো।

শীলা আর কৌতূহল দমন করতে পারলো না। এক সময় তরুণকে জিজ্ঞেস করলো, দুপুরে বলেছিলেন জয়শ্রীর মনের কথা না বুঝতে পারলেই ভালো হতো—ওকথা কেন বলেছিলেন?

তরুণ হাসলো, কারণ তাহলে ওর ওপর রাগ করা কিংবা ওকে দূরে ঠেলে দেয়া আমার পক্ষে কঠিন হতোনা। আজ সব বুঝতে পারি বলে ওর ওপর তো আমি অবিচার করতে পারিনা।

উৎসুক চোখে তরুণের চোখের দিকে তাকিয়ে শীলা জিজ্ঞেস করলো, কী বুঝতে পারেন আপনি?

একটু ইতস্তত করলো তরুণ। তারপর বললো, সবই বুঝতে পারি—কেন ও ছোটো খাটো পাওয়ার জন্যে বড়ো পাওয়াকে দূরে ঠেলে দেয়—

কেন?

তরুণ বললো, এ সমাজে সকলেই তো তাই করে। জয়শ্রী তো অন্য সমাজের লোক নয়। তাকে আমি দোষ দেবো কেমন করে!

বোধহয় তরুণের কথার অর্থ স্পষ্ট হলো না শীলার কাছে। তাই তার দিকে তাকিয়ে ও আবার বললো, আপনার কথা ভালো বুঝতে পারছিনা। জয়শ্রীর যতোই অসুবিধা থাক, আপনার সংগে অমন কঠিন ব্যবহার করা ওর কিছুতেই উচিত নয়—

শীলাকে বাধা দিয়ে তরুণ বললো, তবু জয়শ্রীর আমি কোনো দোষ দেখতে পাই না। আমার মনে হয় এই সমাজে বাস করে ওর পক্ষে আমার সংগে অন্য কোনো রকম ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

মৃদু স্বরে শীলা বললো, আপনি ওকে খুব বেশি ভালোবাসেন বলে এমন কথা বলছেন। কিন্তু আমিও ওর বিশেষ বন্ধু সেই কারণে না বলে পারছি না যে ও আপনার সংগে অসম্ভব রকম বেশি অন্যায় ব্যবহার করেছে। শুধু আপনার সংগে নয় নিজের সংগেও—

তা না করে ওর উপায় নেই। ভালোভাবে বেঁচে থাকবার চেষ্টা প্রত্যেক মানুষ করে থাকে—

কিন্তু জয়শ্রী তো ভালোভাবে বেঁচে নেই। আমার কাছে ও মন খুলেছে। আমি জানি ওর মনে এতোটুকু শান্তি নেই।

আমিও জানি। সংসারে বাস করতে হলে কখন মানুষের মনে শান্তি থাকে বলা কঠিন। মনের শান্তি না থাকলেও আজ যদি ওর অন্য কোনো ভাবনা না থাকতো তাহলে হয় তো কিছুতেই ও আমার কাছে এতোখানি কঠিন হতে পারতো না।

শীলা বললো, সেইখানেই আমার আপত্তি। আপনার কাছে কঠিন হবার ওর কোনো প্রয়োজন ছিলোনা। আপনাকে ও ভালোভাবে নিজের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বললেই পারতো।

তরুণ হেসে বললো, আপনি নামকরা সাহিত্যিকের মেয়ে, তাই এমন কথা বলছেন। কিন্তু সকলে তো জীবনকে একভাবে দেখতে পারে না।

লজ্জা পেয়ে শীলা বললো, না পারুক, সামাজিক বিধি ব্যবস্থার জন্যে জয়শ্রী যদি আপনাকে যোগ্য মূল্য দিতে না পারে তাহলে আমি তাকে দোষ দেবো না কিন্তু স্থূল লোভে দিশা হারিয়ে ওর এমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠবার কোনো মানে হয় না।

শীলার গভীর মনের পরিচয় পেয়ে খুশি হয়ে তরুণ বললো, দিশা আমরা সকলেই হারাই। কেউ আগে কেউ পরে। আজ জয়শ্রী সংসারের যে ভার মাথায় তুলে নিয়েছে, ওর তো তা নেবার কথা নয়। তাই জীবনের স্থূল পাওনা আদায় করে নেবার জন্যে ও আরও বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কেননা ওর ধারণা যেমন করে হোক আদায় করে নিতে না পারলে ও কোনোদিনও কিছু পাবে না—

কিন্তু ওর এমন ধারণা হবে কেন?

তরুণ হাসলো, কারণ ওর কিছু পাবার আশা নেই, একটু চুপ করে থেকে ও আবার বললো, এ সমাজে যারা যতো কম পায়, ছোটোখাটো পাওনা নিয়ে তারাই ততো বেশি মাথা ঘামায়। যদি জয়শ্রীর জীবন সামান্য সহজ হতো তাহলে হয়তো স্থূল লোভে ও এমন করে কিছুতেই দিশা হারাতো না। আবার কিছুক্ষণের জন্যে থামলো তরুণ, ট্রামে বাসে কখনও লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, একটা বসবার জায়গা খালি হলে কেমন আশ্চর্য রকম ঠেলাঠেলি পড়ে যায়, কে বসবে তাই নিয়ে তর্কাতর্কি চলে অনেকক্ষণ, তরুণ হাসলো, ব্যাপারটা খুবই সামান্য। পাঁচ জন ভাবে এ নিয়ে এতো ঠেলাঠেলি করা চরম অভদ্রতা। আমি কিন্তু যে জোর করে বসতে যায় তাকে মনে মনে কখনও দোষ দিতে পারি না।

শীলা জিজ্ঞেস করলো, কেন?

কারণ আমাদের পুঁজি খুব সামান্য। আশ্রয়ও অনিশ্চিত। সব সময় সব কিছু হারাবার আতঙ্কে আমরা বিহ্বল। তাই যখন যেটুকু পাই তখন সেটুকু আদায় করে নেবার জন্যে ব্যস্ত হই। ভদ্রতা, সৌজন্য, অন্যের স্বাচ্ছন্দ্য—এ সব কথা এমন দিনে আমাদের মনে থাকবার কথা নয়। তাই আমি কখনও জয়শ্রীর কোনো দোষ দেখতে পাই না।

প্রশংসার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে শীলা কিছুক্ষণ তরুণের দিকে তাকিয়ে চুপ করে

বসে রইলো। সে মনে মনে জয়শ্রীর সৌভাগ্যের কথা ভাবছিলো । এমন করে কে আর তাকে ভালোবাসবে। কোনো মানুষ যে এমন করে কাউকে ভালোবাসতে পারে তরুণের কথা শোনবার আগে শীলা সেকথা ভাবতে পারে নি। এমন লোকের সংগে তার আলাপ হয়েছে বলে সে যেন নিজেকে ধন্য মনে করলো। তার ইচ্ছে হলো বিকাশের সব কথা তরুণকে বলে কিন্তু হঠাৎ লজ্জা হলো তার। সে ভেবে পেলোনা কেমন করে নিজের কথা শুরু করবে। জয়শ্রী সংগে থাকলে বোধ হয় কিছু সুবিধা হতো। আজ থাক, শীলা মনে মনে ভাবলো, এখন থেকে তরুণের সংগে সে প্রায়ই দেখা করবে। কোনো একদিন সুবিধা মতো বিকাশের কথা সে তাকে জানাবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে তরুণ জিজ্ঞেস করলো, কী ভাবছেন ?

না, মানে, কী বলবে ভেবে না পেয়ে শীলা হঠাৎ বলে ফেললো, আপনার কথাই ভাবছিলাম। আপনার মতো করে জয়শ্রীকে আর কেউ ভালো বাসতে পারবেনা—

জানি না, ম্লান চোখে শীলার দিকে তাকিয়ে তরুণ বললো, আমার কথা শুনতে আপনার কেমন লাগছে জানি না। আপনি জয়শ্রীর বন্ধু, অসঙ্কোচে অনেক আবোল তাবোল বকে যাচ্ছি আপনার কাছে—

বাধা দিয়ে শীলা বললো, যা খুশি বলুন। আপনার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে, একটু থেমে ও আবার বললো, এমন কথা এর আগে আর কারোর কাছ থেকে আমি কখনো শুনি নি—

কী-ই বা এমন বয়স হয়েছে আপনার, হেসে তরুণ বললো, বড়ো হলে এসব কথা আপনি নিজেই ভাবতে পারবেন—

আর কোনো কথা না বলে শীলা নিঃশব্দে চা খেতে লাগলো। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেই রেস্তোরাঁয় অনেক লোক আসা যাওয়া

করছে। পর্দা টানা রয়েছে বলে কারোর চেহারা দেখা যাচ্ছেনা, শুধু পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শীলার মনে হলো তরুণের সংগে এখানে অনেকক্ষণ এমনি করে বসে তার কথা শুনলে সে যেন সব দুঃখ ভুলে যাবে।

বাড়ি ফিরেও সারা রাত সে তরুণের বলা কথাগুলি বারবার ভাবছিলো। সত্যি এ সমাজে হয়তো এর চেয়ে ভালো ভাবে বেঁচে থাকা যায়না। ওঠবার আগে তরুণ বলেছিলো, এ সমাজে নিজের প্রেম যেন নিজেকেই ব্যঙ্গ করে। কেমন করে ভালোবাসায় মন প্রাণ সঁপে দেবে মানুষ। পদে পদে শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়। ইচ্ছে থাকলেও অন্য কোনো দিকে মানুষের মন দেবার সময় নেই। আজ যদি জয়শ্রীর সমস্ত ভার নেবার ক্ষমতা তরুণের থাকতো তাহলে কিছুতেই তার এমন পরিবর্তন হতোনা। তবু আজও অজস্র মানুষের মনে লক্ষ তাজমহল ঝলমল করছে, কিন্তু রূপ দেবার ক্ষমতা নেই কারোর। তরুণ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে সব কিছুর আগাগোড়া পরিবর্তন হবে। বাইরের দৈন্য অদূর ভবিষ্যতে বিপুল সংগ্রামে মানুষ ঘুচিয়ে দেবে। আর তখন মনের দৈন্যের বিশ্লেষণ করবার অবসর পাবে মানুষ। যদি জয়শ্রী বেঁচে থাকে তখন তাহলে দিনরাত সে শুধু তরুণকেই খুঁজে ফিরবে। সেই আশা নিয়ে সে বেঁচে থাকবে। আজ ভুল বুঝে অকারণে দোষ দিয়ে কিছুতেই তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবেনা।

অনেকক্ষণ ঘুম আসে না শীলার।

ছয়

আজকাল চলে ফিরে বেড়াতে সুলতার কষ্ট হয়। মাথা ঘুরে যায় কথায় কথায়। চোখের কোনায় কালি পড়েছে তার। বেঁচে থাকবার এতোটুকু ইচ্ছে নেই সুলতার। তার কেউ নেই, কিছু নেই। এ সংসারে বোধহয় আর কোনো প্রয়োজনও নেই তার। অথচ আশ্চর্য যাদের ভাবনায় তার ঘুম হয়না তারা ভুলেও তার কথা ভাবেনা।

সে জানে কমলেশ ভাবে সে যেন ইচ্ছে করে অশান্তির সৃষ্টি করে চলেছে। অন্য কেউ হলে অভাবের সংসারে খুব সহজে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতো। আর শীলা যেন কী হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। সেও ভাবে মা বাবার ওপর অবিচার করে। কাজেই কী প্রয়োজন সুলতার এ সংসারে বেঁচে থাকবার! সে চলে গেলে বরং অনেকের অনেক সুবিধা হবে। বাপের বাধ্য মেয়ে শীলা। বাপের মতই তার মত। কাজেই ওরা দু'জনে এক মত হয়ে সুলতাকে বাদ দিয়ে অনায়াসে সংসার চালিয়ে নিতে পারবে। সে না থাকলে কারোর কিছু এসে যাবেনা।

এমনি আরও অনেক কথা ভাবতে ভাবতে সুলতার শুকনো চোখে জল এসে পড়ে। সে না থাকলে কমলেশ বোধহয় মুহূর্তের জন্যে তার অভাব বোধ করবেনা। যন্ত্রের মতো সারাদিন যেমন লিখে যায় ঠিক তেমনি লিখে যাবে। কে রইলো আর কে না রইলো সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার তার সময় নেই। মনে মনে হাসি পেলো সুলতার। অথচ বাইরের লোকের ভাবনায় তার ঘুম হয়না। কে কম পেলো, কে বেশি পেয়ে অপচয় করলো, কারা কঠিন উপবাসে শেষ হয়ে গেল—

এই সব নিয়েতো তার সাহিত্য। সুলতার মনের খবর রাখবার তার সময় কোথায়।

আজকাল আর রাগ হয়না সুলতার। সব কিছু শুধু করুণ হয়ে দেখা দেয় তার কাছে। আর শরীর দুর্বল বলে মনের মাঝে অভিমান জমে ওঠে।

তবু বহুদিন হলো স্বামীর কাছ থেকে কিছু পাবার আশা সে ত্যাগ করেছে। বয়স বাড়বার সংগে সংগে হয়তো অভিমানও মিলিয়ে গেছে মন থেকে। সে শুধু চেয়েছিলো তার একমাত্র মেয়ের সুবন্দোবস্ত করে যেতে। সে—সাধও পূর্ণ হলোনা সুলতার।

শীলার ভবিষ্যত ভেবে শিউরে ওঠে সে। তার বোধহয় আর কোনো-দিনও বিয়ে হবেনা। কমলেশের সেবা করে সুলতা যেমন শেষ হয়ে যেতে বসেছে, মেয়েও ঠিক তেমন করে শুধু বাপের পরিচর্যা করে শেষ হয়ে যাবে। কমলেশ কোনোদিন তার দিকে চোখ তুলে তাকাবেনা। মেয়েকে অমন নির্বিকার বাপের ভরসায় রেখে যেতে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে সুলতার। বিকাশের সংগে তার বিয়ে হয়ে গেলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতো। যাহয় হোক কমলেশের। তার কথা আর ভাবতে ইচ্ছে করে না। সারা জীবন ধরে সে শুধু একজনের কথাই ভেবে এসেছে। প্রথম থেকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে বলে আজ তাকে শুধু অবহেলা সম্বল করে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে।

ওদিকে বিকাশের সংগে শীলার গোলমালের কথা তার অজানা নেই। যেদিন সে বিলেত চলে যায় সেই দিনই সুলতা তার আশা ছেড়ে দিয়েছিলো। প্রথম বয়সের প্রেমের জন্যে ক'জন সব কিছু তুচ্ছ করে। শুধু পাঁচ হাজার টাকা যদি কমলেশ যোগাড় করতে পারতো তাহলে কিছুতেই তাকে এমন যন্ত্রনার মধ্যে থাকতে হতোনা।

আজ শীলা বিকাশকে যতোই দোষ দিক, সুলতা তার কোনো দোষ দেখতে পায়না। কিছু অন্যায় কথা লেখেনি বিকাশ। যে দুদিন পরে বাড়ির বউ হবে, তার চাকরি করায় বিরক্ত হবার সম্পূর্ণ অধিকার বিকাশের। অকারণে তাকে ছোটো ভাবলে চলবে কেন। কমলেশের মতো কথা শীলাও বলতে শিখেছে আজকাল। থাক দু'জনে সুখে! সুলতা যখন ওদের মতো করে আজও ভাবতে পারলোনা তখন ওদের সংসার থেকে তাকে সরে যেতেই হবে।

তবু শীলার ভাবনা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে না পেরে সুলতা একদিন কমলেশকে বললো, শোনো, আমার শরীর বড়ো বেশি খারাপ হয়ে পড়েছে—

কমলেশ বললো, কী হয়েছে তোমার সুলতা? কই আমাকে কিছু বলোনি তো?

আমার কথা কবে তোমাকে আমি বলেছি? যাহোক, একটু থেমে সুলতা বললো, এই বয়সে আমার ভাবনা ভেবে তোমাকে সময় নষ্ট করতে হবেনা। কিন্তু শীলার জন্যে সত্যি তুমি কি চিরকাল উদাসীন থাকবে?

অবাক হয়ে কমলেশ বললো, বাঃ, বিকাশ আগে ফিরে আসুক।

আমি জানতাম তুমি কিছু খবর রাখোনা। বিকাশ আর ফিরে আসবেনা—

সে কী? ও নিশ্চই শীলাকে চিঠি লেখে?

না, ওদের আর কোনো যোগাযোগ নেই। শীলার চাকরি করা নিয়ে ওদের গোলমাল হয়ে গেছে।

কমলেশ জোরে হেসে বললো, ও বয়সে অমন মান অভিমান একটু বেশি হয়। ফিরে এলে দেখো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে—

কমলেশকে বাধা দিয়ে কঠিন স্বরে সুলতা বললো, সব ব্যাপার তুমি

যতো সোজা ভাবো ঠিক ততো সোজা নয় বুঝলে? কী আছে তোমার মেয়ের যে অমন রাজপুত্র সব ফেলে তার কাছে ছুটে আসবে?

মৃদুস্বরে কমলেশ বললো, শীলার এখন বয়স হয়েছে, ওর ভাবনা ও নিজে ভাববে। দেখছো না, চাকরি করে ও কেমন সুখে আছে—কেমন আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

সুলতা বললো, যোগ্য বাপের মতো কথা বটে। আশ্চর্য! তোমার মুখে ছাড়া এমন কথা আর কারোর মুখে মানায় না।

হাসিমুখে কমলেশ বললো এসব কথা ভেবে কেন শরীর খারাপ কর সুলতা? এখন এমন সময় পড়েছে যে সকলেই নিজের ভাবনা আগে ভাবে—

শুধু তুমি ছাড়া—

সেকথা কানে না তুলে কমলেশ বললো, শীলা চাকরি করছে, পাঁচজনকে দেখছে, ঠিক সময় ও নিজে যা ভালো বোঝে তাই করবে। তোমার আমার অপেক্ষা করবে না।

একটা বেকার লেখককে যদি বিয়ে করে বসে?

করবে। তুমি কী করতে পারো? বাধা দিতে গেলে শুধু নিজেদের অশান্তি ভোগ করতে হবে।

যদি কিছু হয় তোমার জন্যেই হবে। ওইটুকু মেয়েকে কেউ চাকরি করতে পাঠায়?

কমলেশ হেসে বললো, বাইরের জগতের খবর রাখো না বলে তুমি একথা বলছো। আজকাল কেউ বাড়িতে বসে সময় নষ্ট করে না। যার বুদ্ধি আছে সে কিছু না কিছু করে আরও ভালো করে সংসার সাজায়—

একটু ভুল বললে, দু' এক মিনিট চুপ করে থেকে সুলতা বললো, সংসার সাজায় না, সংসারের সব কিছু উল্টে দেয় বলো!

তবু ওরা সুখী হয়। তুমি যেমন চাও তেমন করে হয়তো আমি ওকে মানুষ করতে পারিনি। কিন্তু ওকে দেখে বুঝতে পারি ওর কোনো দুঃখ নেই। জীবনের যে কোনো অবস্থায় মেয়ে যদি সুখে থাকে তাহলে শুধু শুধু বাপ মায়ের ভাবনা করবার কী কারণ থাকতে পারে ?

থাকলেও তোমার মতো মানুষ কোনোদিনও সে কারণ খুজে পাবে না। আমাকেও সারাজীবন ধরে তুমি নিশ্চয়ই খুব সুখী ভেবে এসেছো ?

নিশ্চয়ই।

তাই আমি শান্তিতে মরতে পারবো না, রুদ্ধস্বরে সুলতা বললো, তোমার মতো বাপের কাছে মেয়েকে রেখে যেতে হবে বলে আমি—কথা শেষ করতে পারলো না সে। কান্নায় স্বর অস্পষ্ট হয়ে গেল সুলতার।

পাথরের মূর্তির মতো কমলেশ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর গভীর স্নেহে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, ছিঃ সুলতা, এ সব কথা আমাকে বলতে নেই। তুমি তো আমাকে ভালো করেই জানো। তাহলে এ সব কথা বলে আমাকে দুঃখ দাও কেন ? তুমি ভুল বুঝলে আমার সব গোলমাল হয়ে যায়—আজও সেকথা বুঝতে পারো না কেন ?

কমলেশের হাত সজোরে দূরে ঠেলে দিয়ে অস্বাভাবিক স্বরে সুলতা বললো, সরে যাও !

ছুটির দিনে যে কোনো সময় নীলিমা কমলেশের সংগে দেখা করতে আসে। আর মনের অবস্থা ভালো না হলে আপিসের পর সোজা এসে হাজির হয় এখানে।

সেদিন কী একটা কারণে দুপুর বেলা আপিস ছুটি হয়ে গেল। কয়েক দিন নীলিমার সংগে কমলেশের দেখা হয়নি। একটা নতুন কথা বলতে

হবে তাকে। তাই ছুটি হবার সংগে সংগে সে রওনা হলো কমলেশের বাড়ির দিকে।

কমলেশকে কেমন করে বলবে কিংবা একথা শুনে সে কি ভাববে—এসব নিয়ে নীলিমা মুহূর্তের জন্যেও বিব্রত হলো না, শুধু এই ভেবে মনে মনে সে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো—তাকে বলতে হবে—তাকে সব বলতে হবেই। তার মনের গভীর গহনে যে সুর বেজে উঠেছে—এই পৃথিবীতে বোধহয় একমাত্র মানুষ কমলেশ যে সেই সুরের পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে।

জয়ন্তকে ছেড়ে যাওয়া নীলিমা যতো সহজ ভেবেছিলো, যথাসময়ে দেখা গেল সেই সহজ ব্যাপার অত্যন্ত কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। না, এ জীবনে বোধ হয় সে জয়ন্তকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

কেন এমন হলো? কেন এমন হয়? যার সংগে তার শুধু আইনের সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই, যাকে তার দৈনন্দিন জীবনে কোনো প্রয়োজন নেই, যার উপস্থিতি তার কাছে পীড়াদায়ক—তার সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে শঙ্কা জাগে কেন নীলিমার? কেন মনে হয় কোথায় যাবে মানুষটা? যদি অযত্নে শেষ হয়ে যায়? নিজের প্রয়োজন মতো অর্থ উপার্জন করবার যার ক্ষমতা নেই, কে তার আহার যোগাবে সারা জীবন? জয়ন্ত যাই বলুক, নীলিমা জানে সে ছাড়া তার আপনার লোক আর কেউ নেই। কেউ তাকে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করবে না। এমন অসহায় মানুষকে নিষ্ঠুরের মতো পথে বার করে দিতে চোখে জল আসে নীলিমার।

অথচ আশ্চর্য, দু'দিন আগে তার এসব কথা মনে হয়নি। বার বার সমাজের প্রতিকূল অবস্থার কথা ভেবেও সে জয়ন্তর সংগে সব সম্পর্কের অবসান ঘটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কেন তার সব

কিছু গোলমাল হয়ে যায়? কেন অকস্মাৎ বেদনা বোধ প্রবল হয়ে ওঠে?

কারণ নীলিমা আবার নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেয়েছে। সে পরিপূর্ণতার স্বাদ পেয়েছে বেদনা বোধের মহিমায়। কমলেশ নিজের অজ্ঞাতে তাকে এমন কিছু দিয়েছে যা ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে তার মনের নিভৃতে। এমন মানুষ কখনও দেখেনি নীলিমা। তাই কী জানি কেন, একটা অদ্ভুত নিরাসক্তি তার সারা মন ভরে তুলেছে। কিছু না পাক ক্ষতি নেই, হারানোর চুল চেরা হিসেব করবার অবসর নেই তার, ছোটো খাটো দেনা পাওনা তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। সব কিছু ভালো লাগছে তার, সকলকে ভালো লাগছে। অপূর্ব মহিমায় আলো হয়ে আছে তার সারা দেহ মন। তাই কাউকে সামান্য দুঃখ দেবার ইচ্ছে নেই তার। জয়ন্তর অতিরঞ্জন, তার মিথ্যা ভাষণ, তার অক্ষমতা আর শূন্যে সৌধ নির্মাণ—সব কিছু আজ হঠাৎ নতুন করে নীলিমার ভালো লাগছে। তার মধ্যে যে এমনি এক আনন্দ-লোক আছে সে সন্ধান কে দিলো তাকে? তাকে তো এতো স্পষ্ট করে সব কথা বলা যাবে না। তবু যেমন করে হোক তাকে সব বলতে হবেই।

নীলিমাকে দেখতে পেয়ে কমলেশ অধীর আগ্রহে বলে উঠলো, এতোদিন আসোনি কেন?

তার স্বর ভারী ভালো লাগলো নীলিমার। ইচ্ছে হলো উত্তরে বলে তোমার মুখ থেকে এমনি আহ্বান শুনবো বলে ইচ্ছে করেই আসিনি।

কিন্তু মুখে সে বললো, অনেক কাজ জমা হয়ে আছে না আপনার বলেছিলেন, তাই ভাবলাম শুধু শুধু আপনার সময় নষ্ট করবো না—

কী যে বল, বাধা দিয়ে কমলেশ বললো, সত্যি অনেক কাজ আমার এখন, মাঝে মাঝে বড়ো ক্লান্ত মনে হয়। তখন তোমার কথা আমার মনে পড়ে নীলিমা।

মৃদুস্বরে নীলিমা বললো, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোটো। কিন্তু তোমার সংগে কথা বললে আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এতো কথা আমি বোধহয় আর কারোর সংগে কখনও বলি নি নীলিমা।

নীলিমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রোমাঞ্চ জাগলো তার। আর মনে হলো কমলেশ অনেকক্ষণ এমনি স্পষ্ট ভাষায় তার সংগে কথা বলে যাক।

কমলেশ বললো, খুব কম বাইরে যাই। কিন্তু ক'দিন ধরে তোমার সংসার দেখবার বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে। একদিন আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে নীলিমা?

নিশ্চয়ই, কবে যাবেন বলুন? অনেকবার ভেবেছি আপনাদের যেতে বলবো। কিন্তু সাহস পাইনি।

আমাকে তোমার ভয় কী? চলো আজই যাই?

একটু ইতস্তত করে নীলিমা বললো, আজই?

আসলে আজ কমলেশকে তার নিয়ে যাবার ইচ্ছে নেই। অগোছাল হয়ে আছে চারপাশ। জয়ন্ত বাড়ি আছে কিনা কে জানে। তার চেয়ে আর একদিন নীলিমা তাকে নিয়ে যাবে। ভালো করে ঘর সাজিয়ে রাখবে। নিজে বাজার করবে। তারপর নিজের হাতে মনের মতো রান্না করে যত্ন করে খাওয়াবে কমলেশকে। পরমুহূর্তেই নীলিমার মনে হলো কী প্রয়োজন এতো কাছের মানুষের সংগে লৌকিকতা করবার। যখন মুখ ফুটে যাবার কথা বলেছে তখন আজই তাকে নিয়ে যেতে হবে। যেমন মানুষ কমলেশ, আবার কবে যেতে চাইবে কে জানে।

নীলিমা বললো, চলুন। দিদিকে বলে আসি?

কোথায় গেল সুলতা? তোমাকে আসতে দেখেনি নাকি? দেখ

তাকেও সংগে নিতে পারো কি না।

নীলিমা অন্য ঘরে যেতে যেতে হেসে বললো, ঠিক পারবো দেখবেন। কিন্তু শীলা এখনও এলোনা কেন? আজ তো অনেক আগে আপিস ছুটি হয়ে গেছে?

কমলেশ হেসে বললো, হয় তো কোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে কিংবা ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। বাইরের জগতের সংগে যার নতুন পরিচয় হয়েছে সে সহজে ঘরে আসতে চাইবে কেন?

নীলিমা বললো, শীলার বহু ভাগ্য যে আপনার মতো বাবা পেয়েছে।

কমলেশের ইচ্ছে হলো সুলতার বলা কথাগুলি নীলিমাকে শোনায়। কিন্তু সে ততোক্ষণে অন্য ঘরে চলে গেছে। আজ বোধহয় আর লেখা হবে না। কলম বন্ধ করে ওপরে তাকিয়ে কমলেশ নীলিমার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরে প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো নীলিমা, শিগগির আসুন, দিদি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

কমলেশ ব্যস্ত হয়ে এসে দেখলো রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে সুলতা পড়ে আছে। নীলিমার সংগে ধরাধরি করে সে তাকে ঘরে এনে খাটে শুইয়ে দিলো। একটু অবাক হয়ে গেছে কমলেশ, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। এতোদিনের মধ্যে সুলতার কখনও এমন হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

নীলিমা জলের ছিটে দিলো তার মুখে চোখে। কোথা থেকে একটা পাখা জোগাড় করে এনে বাতাস করতে লাগলো। অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবু সুলতার জ্ঞান হয় না।

নীলিমা বললো, এখনও জ্ঞান হচ্ছে না। আমার মনে হয় একটা ডাক্তার ডাকা দরকার।

আমি এখুনি যাচ্ছি, পাশের ওষুধের দোকান থেকে কমলেশ ডাক্তার গুহকে নিয়ে এলো। ইনি অনেক দিন থেকে এ পরিবারের চিকিৎসক।

ডাক্তার আসবার আগেই জ্ঞান ফিরে এসেছিলো সুলতার। নীলিমার দিকে শীর্ণ চোখে তাকিয়ে সে বললো, শীলা কোথায় ?

এখুনি আসবে। আপনি একটু চুপ করে শুয়ে থাকুন।

তাই থাকবো; আর আমি উঠতে চাই না, শীলা এখনও আসছে না কেন ?

ডাক্তার গুহ অনেকক্ষণ ধরে সুলতাকে পরীক্ষা করে বললেন, হার্টের অবস্থা খুব দুর্বল। ওঁকে এখন শুধু বিশ্রাম করতে হবে। খাওয়া দাওয়া ইনি বোধহয় কিছুই করতেন না। খুব খারাপ খাওয়া খেলে তবে এমন অবস্থা হয়।

ডাক্তারের কথার উত্তরে কিছুই বলতে পারলোনা কমলেশ। নিঃশব্দে সুলতার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। নীলিমা তখনও বাতাস করে যাচ্ছে।

ডাক্তার চলে যেতেই সুলতা যেন আপন মনেই বলে উঠলো, ডাক্তারবাবু কাকে ওসব কথা বলে গেলেন ? দেয়ালকে ? আমি কী খাই না খাই, আমি বেঁচে আছি কি না এ বাড়ির কে তার খবর রাখে ?

ছিঃ, দিদি ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করবেন না। চোখ বুজে বিশ্রাম করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মুচকি হেসে সুলতা বললো, তাই যেন হয় !

সন্ধ্যের একটু আগে শীলা বাড়ি ফিরলো। আজ তরুণের সংগে সে ছবি দেখতে গিয়েছিলো। আজকাল শীলা প্রায়ই তরুণের সংগে এখানে

ওখানে ঘুরে বেড়ায়। তরুণের ভালোবাসাকে সে নিজের অজ্ঞাতে কখন ভালোবেসে ফেলেছে। তাই তার প্রতি শ্রদ্ধায় শীলার মন ভরে থাকে।

এরমধ্যে একদিন তরুণ এসে কমলেশের সংগে আলাপ করে গেছে। সুলতাও দেখেছে তাকে। কিন্তু আগে থেকেই শীলা জানতো তার মতো ছেলের কোনো মূল্য মা দেবেনা।

হলোও তাই। সুলতা যেটুকু প্রয়োজন তাকে যথারীতি সমাদর করলো। কিন্তু বেশি কথা বললো না। কোনো উৎসাহ প্রকাশ করলো না তরুণের সম্পর্কে।

সে চলে যেতে শীলাকে বললো সুলতা, এখন বুঝি এর সংগে তোমার ভাব হয়েছে?

হ্যাঁ মা, সহজ সুরে শীলা বললো, আমাদের আপিসে চাকরি করে। খুব ভালো লোক।

যাদের আর কিছু থাকেনা, তারা যদি ভালোও না হয় তাহলে কী রইলো তাদের? শেষ অবধি তোমার কপালে অমনি একটা কেরানী জুটবে তা আমি জানি।

শীলা আশা করেনি হঠাৎ সুলতার মুখ থেকে এমন কথা শুনবে। তাই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ একটু পরে বললো, কার কী আছে না আছে সে—খবরে সব সময় আমার কী দরকার মা? কিন্তু যার কথা শুনতে ভালো লাগে তার সংগেই আমার বেশি মিশতে ইচ্ছে করে।

কথা শুনেই পেট ভরে না জানো?

অনেকের ভরে মা।

তর্ক করোনা শীলা। আমাকে দেখে এসব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার?

না, তোমার মতো আমি যেন কোনোদিন কাউকে ছোট করে না দেখতে পারি। আমার মনে হয় খারাপ বড়োলোকের চেয়ে গরিব ভালো লোক সত্যিই অনেক— অনেক ভালো।

সুলতা চিৎকার করে উঠলো, তাই বলে একজন কেরানীর সংগে গলা ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াবে?

জানিনা। দায়ে পড়ে অনেককে অনেক কিছু করতে হয়। কিন্তু তাদের আসল পরিচয় তো তা নয়, শীলা আরও স্পষ্ট করে সুলতাকে বললো, অনেক মহৎ মনের মানুষকে তুমি ছোটো মনে করে অবজ্ঞা কর, কিন্তু কতো বড়োলোক জাত-কেরানীর মন নিয়ে মনুষ্যত্বকে অবহেলা করে সে-খবর রাখোনা—

থামো! ওসব কথা আমাকে না শুনিয়ে তোমার বাবাকে গিয়ে বলো। তাহলে শুধু কথা বলে আর শুনে পেট ভরে যাবে দুজনের।

পা টিপে টিপে শীলা অতি সন্তর্পণে বাড়ি ঢুকলো। সুলতা তার কোন খুঁত ধরে ঠিক নেই। আজকাল মাকে ভয় করে সে। কখন কী বলে বসে বলা যায় না।

কিন্তু মা কোথায়? রান্না ঘরে কেউ নেই। শোবার ঘরে এসে শীলা অবাক হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে সুলতা শুয়ে আছে। আর ম্লান মুখে বিছানার একধারে বসে আছে কমলেশ।

কী হয়েছে বাবা? সুলতার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে শীলা জিজ্ঞেস করলো।

তার গলার স্বর শুনে সুলতা চোখ খুললো, কোথায় ছিলি এতোক্ষণ?

কী হয়েছে মা তোমার? এখন শুয়ে আছো কেন?

কিছু হয়নি, কমলেশের দিকে তাকিয়ে সুলতা বললো, তুমি অনেকক্ষণ বসে আছো। যাও এবার ওঘরে গিয়ে একটু লেখো—

না সুলতা, লিখতে পারবোনা আমি এখন—

না না, তুমি এঘর থেকে এখন যাও। তা নাহলে আমি উঠে পড়বো

কিন্তু—শীলার সংগে আমার কথা আছে যে—.

অনিচ্ছাসত্বে কমলেশ অন্য ঘরে চলে এলো। একটু আগে নীলিমা চলে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে রোজ সুলতার খবর নিতে আসবে। কাউকে কিছু না বলে বাচ্চা চাকরের সাহায্যে উনুন ধরিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করে গেছে সে। সুলতা বাধা দিতে গিয়েছিলো। কিন্তু তার কথা শোনেনি নীলিমা। সব কিছু প্রায় করে গেছে। যেটুকু বাকি আছে তা শীলা সহজেই করে নিতে পারবে।

সেই সব কথাই শীলাকে বলছিলো সুলতা। কী কী করতে হবে তাকে, কী খেতে ভালোবাসে কমলেশ, না চাইলেও কখন তাকে চা পাঠাতে হবে। এসব খবর নিশ্চয়ই শীলা জানেনা এমন সন্দেহ করে সুলতা তাকে যেন পাখি পড়িয়ে দিচ্ছিলো। সে নিজে দু'একবার ওঠবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। হঠাৎ এতো দুর্বল সে হয়ে পড়লো কেন। উঠতে গেলেই মাথা ঘুরে যায় তার।

যত্নের কোন ত্রুটী হলোনা। কমলেশ তার ঘরেই সারাদিন কাটায়। শীলা ছুটি নিয়েছে কয়েক দিন। তার ওপর নীলিমা রোজ এসে নানা রকম সাহায্য করে যায়। ডাক্তারও আসে নিয়মিত।

নীলিমাকে দিয়ে এ সব বাজে কাজ করাতেই সুলতার যতো আপত্তি উঠতে পারেনা। বিছানায় শুয়ে জোরে নীলিমাকে কাছে ডেকে অনেকক্ষণ হাঁপায়।

কী বলছেন দিদি ?

বলছি, দম নিয়ে সুলতা বলে, তুমি রান্না ঘরে গিয়ে ওসব বাজে কাজ কর কেন ? আমার বড়ো খারাপ লাগে। শীলা তো একাই চালিয়ে নিতে পারে।

বাজে কাজ মানে ? অভিমানের ভান করে নীলিমা বলে, আপনি আজও আমাকে পর ভাবেন। আপনি নিজে এসব কাজ রোজ করতেন যে—

আহা, আমার কথা আলাদা। তুমি লেখা পড়া জানা মেয়ে। ওঁর সংগে লেখা নিয়ে আলোচনা করতে আসো। তোমাকে দিয়ে এসব কাজ করানো আমার খুবই অন্যায়—

আপনি তো করান না, হাসিমুখে নীলিমা বলে, আমি জোর করে নিজেই সব করি।

কেন করে সেকথা স্পষ্ট করে কাকে বলবে নীলিমা !

অনেকদিন কেটে গেল কিন্তু সুলতার শরীরের কোনো উন্নতি হলোনা। সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে তার। তাই থেকে থেকে চোখে জল আসে। আজ আর তার রাগ হয়না কারোর ওপর। আজ এ সংসার ছেড়ে যেতে দুঃখ হয় তার।

শীলার সংগে যতোই তর্ক করুক, স্বামীর ওপর যতোই রাগ করুক, আজ বিছানায় শুয়ে সে তো দেখতে পাচ্ছে তাকে বাদ দিয়ে তারা কতো অসহায়। বেচারী কমলেশ ! সে না থাকলে কে তাকে দেখবে। তার নিজের সংসার সে ছাড়া আর কে তার মতো করে সব বুঝে চালাবে।

কমলেশকে কাছে ডাকলো সুলতা, ওগো শোনো, তোমাকে অনেক গালমন্দ করেছি, আমার কোনো দোষ নিওনা—

ছিঃ সুলতা, স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কমলেশ বললো, কবে আমি তোমার কোন দোষ ধরেছি? এখন এসব বাজে কথা ভেবে শরীর আরও খারাপ করো না—

বাজে কথা নয়, আমি আর বাঁচবোনা কিনা তাই এসব কথা মনে আসছে—

ওসব কথা বলোনা সুলতা। কেন বাঁচবে না? তুমি না থাকলে আমাকে সহ্য করবে কে? আমাকে তোমার মতো যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখবে কে?

সুলতার চোখে দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, এসব কথা এমন করে তুমি আমাকে আগে কখনও বলোনি তো?

মুখে বলেছি কিনা জানিনা তবে মনে মনে অনেকবার বলেছি তা কি তুমি বুঝতে পারোনি?

পেরেছি বলেই তো শেষ সময় সব ছেড়ে যেতে বড়ো কষ্ট হচ্ছে। শীলা কোথায়?

বোধহয় রান্না ঘরে। তাকে ডেকে দেবো?

হ্যাঁ দাও, আর শোনো?

কমলেশ বললো, বল?

একটা কথা রেখো, যতো তাড়াতাড়ি হয় একটা ভালো ছেলের সংগে শীলার বিয়ে দিয়ে দিও—কিন্তু তাহলে তোমার কী হবে? তোমাকে কে দেখবে? তুমি যে কিছুই পারোনা—

আমাকে তুমি দেখবে সুলতা—চিরদিন। এসব কথা কখনও আর তুমি আমাকে বলোনা। চুপ করে শুয়ে থাকো এবার।

স্বামীর মুখের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে সুলতা সত্যি চুপ করে শুয়ে রইলো।

সংসারের যখন এমন অবস্থা তখন হঠাৎ একদিন বিকাশের চিঠি এলো! দু'টো আলাদা চিঠি লিখেছে সে। একটা শীলাকে আর একটা কমলেশকে।

কমলেশ পাওয়ামাত্র খাম ছিঁড়ে বিকাশের চিঠি পড়তে লাগলো। প্রথমে দুঃখ করেছে বিকাশ, নানা কারণে এতোদিন কাউকে চিঠি লিখতে পারেনি। পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। তাছাড়া নতুন জায়গায় নানা রকম অসুবিধা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলো। তারপর ইউরোপের আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছে। ইংরেজী কবিতার ধারা সম্বন্ধেও আলোচনা করেছে।

বিকাশের চিঠি পড়তে পড়তে খুশি হলো কমলেশ। শীলাকে ডেকে তার হাতে দিলো সে চিঠি। আর ভাবলো সুলতা নিশ্চই অনেকদিন পর বিকাশের খবর পেয়ে খুশি হবে। শীলাকে নিয়ে একটা বিশ্রী রকম অশান্তি আছে ওর। তা হয়তো দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তখুনি কমলেশ সুলতাকে কিছু বলতে পারলোনা কারণ সে ঘুমোচ্ছিলো। ভাবলো ওর ঘুম ভাঙলেই প্রথমে এ খবর দেবে।

ওদিকে দুটো চিঠির কোনোটাই শীলা অনেকক্ষণ পড়লোনা। নিজের কথা ভেবে অবাক লাগে শীলার। কিছুদিন আগে বিকাশের চিঠির মূল্য তার কাছে কতো বেশি ছিলো। অথচ আশ্চর্য, যে এই চিঠি লিখেছে তার সম্পর্কে সামান্য কৌতূহল নেই শীলার তাকে ঠিক আর পাঁচজন পরিচিতের মতো মনে হয়।

তবু এক সময় বিকাশের চিঠি খুললো সে। দুঃখ করে, অভিমান জানিয়ে বিকাশ লিখেছে। দু'বার সে চিঠি পড়লো শীলা।

আমি জানি না কেন তুমি আমাকে আর চিঠি লিখলে না। আমি তোমাকে যা লিখেছিলাম তার উত্তরে তুমি আমাকে অনেক কঠিন কথা

শুনিয়েছিলে। তোমার কাছ থেকে তেমন কথা শুনবো বলে আমি আশা করিনি। যাহোক তবু তার উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে আর কিছু বলবার দরকার মনে করলে না। শীলা, তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানিনা। দূরে এসেছি বলে তোমার সংগে আমার ভুল বোঝাবুঝি হবে একথা ভাবতে কষ্ট হয়।

যদি আমি তোমাকে অন্যায় কিছু লিখে থাকি তাহলে কেন সব কথা বুঝিয়ে আমার ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা করলে না? আমি মানি তোমাকে রূঢ় ভাষায় চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু তার জন্যে এমন আশ্চর্য নীরব থাকবার কী অর্থ হয়? তোমার ওপর আমার রাগ করবার অধিকারও কি নেই?

অনেক দিন হয়ে গেল তোমার সংগে দেখা নেই। তোমাকে দেখিনি কিন্তু পৃথিবীকে দেখেছি। তাই আমার অনেক ভুল ভেঙে গেছে—অনেক সংস্কার কেটে গেছে। তোমার কাছ থেকে দূরে এসে তোমার প্রভাব আমার পৃথিবী ভরে দিয়েছে কত না বৈচিত্র্যে!

এ সময় তুমি আমার ওপর রাগ করে থেকো না। অনেক দিনের অনেক কথা জমা হয়ে আছে। দেখা হলে সব বলবো।

চিঠি পেয়েই উত্তর দিও।

খোলা চিঠি হাতে নিয়ে শূন্য চোখে সামনে তাকিয়ে রইলো শীলা। এখন সে কী করবে? এ চিঠি বিকাশ যদি মাস কয়েক আগে লিখতো তাহলে এমন দ্বন্দ্ব আসতো না তার মনে। কিন্তু আজ সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না এ চিঠি তার একান্ত আপনার জনের লেখা। তার

চাকরি করবার জন্যে বিকাশ যদি তাকে তখন অভিযোগ করে নাও চিঠি লিখতো তাহলেও হয়তো অকারণে আজ তেমন করে বিকাশকে স্বীকার করে নেয়া শীলার পক্ষে কঠিন হতো।

দূরে গেছে বলে নয়, তার প্রতি অবিচার করেছে বলে নয়, হয়তো তার পরিধি বেড়ে গেছে বলে সে শুধু বিকাশকে ঘিরে কোন গণ্ডি টানতে পারছে না। আজ বিকাশকে সে আরো ভালো করে বুঝতে পারে। সে জানে বিকাশের সংগে তার কোনোদিনও মতের সম্পূর্ণ মিল হবে না। তাই আগের মতো করে তাকে পাবার তার ইচ্ছে নেই।

হয়তো কেউ শীলাকে বুঝবে না—বিকাশও নয়। শুধু সে তাকে একটা কঠিন চিঠি লিখেছে বলে শীলা তার সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে দিচ্ছে না,—সে কাউকে বলতে পারবে না—আজ সত্যি বিকাশকে 'তার সামান্য প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাকে কেমন করে সেকথা জানাবে শীলা জানে না। মিথ্যা আশা দিয়ে কাউকে সে নিরাশ করতে চায় না। বিকাশ স্পষ্ট শীলার মনের কথা বুঝে নিক আজ। কেন শীলা তাকে আর চিঠি লিখলো না, কেন কোনো খোঁজ নেবার জন্যে ব্যাকুল হলো না—সে কি শুধু সেই সামান্য কারণেই?

যা হোক একটা চিঠি এক সময় লিখতে হবে বিকাশকে। সে যেন তাকে এতোটুকু ভুল না বোঝে, সে যেন ফিরে এসে মিথ্যা আশা করে হতাশ না হয়। যতো কঠিন মনে হোক, স্পষ্ট ভাষায় শীলা সব কথা লিখবে বিকাশকে। তাহলে এই ব্যাপারে তার আর কোনো দায় থাকবে না। কিন্তু এতো ব্যস্ত হবার দরকার কী! ইতস্তত করলো শীলা, যাক না কিছুদিন, কোনো একদিন সময় করে চিঠি লিখতে বসলেই হবে এখন। আর সেই দিন কমলেশের সংগেও তার কথা হলো বিকাশকে নিয়ে।

বাবার সামনে আগে বিকাশের নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা হতো শীলার। আজ কিন্তু অসংকোচে সে সব কথা বললো। কমলেশ কোনোদিনও কোনো ব্যাপারে বেশি কথা বলে না। আজও কিছু বললো না। চুপ করে সব শুনলো শুধু।

প্রথমে অবশ্য কথা তুললো কমলেশ, শীলা, তোর মা শুনলে কতো খুশি হবে। বিকাশকে তোরা সকলে ভুল বুঝেছিলি—

না বাবা, শীলা মৃদুস্বরে বললো, মা কী বুঝেছে জানি না। আমি কিন্তু ভুল করিনি।

আমি জানতাম, কমলেশ বললো, ভালো করে ওকে একটা চিঠি লিখে দে। তোদের বিয়ের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলে সুলতার সব অসুখ সেরে যাবে।

শীলা দু'এক মিনিট চুপ করে রইলো। তারপর মাথা নিচু করে কমলেশকে বললো, আমি বিয়ে করবো না বাবা।

পাগলি, কমলেশ শীলার পিঠে হাত রেখে বললো, বিয়ে না করে সারা জীবন কী করবি তুই? আর কতো আশা নিয়ে ফিরে আসবে বিকাশ—তাকে নিরাশ করলে সে কী ভাববে তোকে?

কিছু ভাববে না বাবা। দু'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, একটু থেমে শীলা আবার বললো, তোমার কাছ থেকে সব সময় সত্যের জন্যে সব কিছু বরণ করবার শিক্ষা পেয়েছি। আজ আমি অনেক কিছু জেনেছি, অনেককে দেখেছি। তাই শুধু নিজের স্বার্থের জন্যে সব ভুলে সকলকে ফেলে একা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে চোরের মতো মাথা গুঁজতে যাবো না—তা করতে আমার ভালো লাগবে না বাবা।

কিন্তু তাহলে কী করবি তুই শীলা?

শীলা হেসে বললো, সেকথা সারা জীবন ধরে ভাববো। এখন

থাকনা। বিকাশকে আজকাল আর আমি আপনার বলে ভাবতে পারি না। ওকে আমার অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হয়। দূরের মানুষের সংগে ইচ্ছের বিরুদ্ধে দূরে চলে যাবো কেমন করে!

কমলেশ আর কিছু বললো না। জোর করে কাউকে কিছু বোঝাবে না সে—শীলাকেও নয়। ওর বুদ্ধি দিয়ে হৃদয় দিয়ে ও নিজে বুঝতে শিখুক সব কিছু। তারপর আপনি একদিন ও খুঁজে নেবে নিজের পথ। আজ থেকে যতোদিন খুশি আপনার মনে শীলা তার সত্যের পরীক্ষা করুক। কী বলবার আছে কমলেশের!

আজ সারা রাত কমলেশকে লিখতে হবে। আর প্রায় পাতা কুড়ি মতো লিখতে পারলেই তার নতুন উপন্যাস শেষ হয়ে যায়। লেখার তাগিদে না হোক, সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে এ বই তাকে এক রাত্রের মধ্যে শেষ করতেই হবে। সুলতা তার চোখের সামনে শেষ হয়ে যাচ্ছে, অবিলম্বে ভালো মতো চিকিৎসা হওয়া দরকার। এমন করে তাকে কিছুতেই কমলেশ মরতে দিতে পারে না। টাকার অভাব এর আগে এমন করে সে আর কোনোদিনও বোধ করেনি। কেন এমন হয়?

শীতকাল। কিন্তু হঠাৎ বেশ গরম পড়ে গেছে। প্রথম বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রাত অনেক। শীলা আর সুলতা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। বাচ্চা চাকরটা কাজ শেষ করেছে একটু আগে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। নিস্তব্ধ নিঃঝুম চারপাশ। খোলা কলম হাতে নিয়ে কমলেশ বসে আছে। তার সামনে শুধু এক রাশ সাদা কাগজ।

কী লিখবে কমলেশ? কেমন করে লিখবে? কিসের জন্যে লিখবে? শীলার ভবিষ্যৎ কুয়াশা কঠিন, সুলতা রোগশয্যায় আর সে নিজে রিক্ত

অবসন্ন। সমস্ত জীবন ভরে কঠোর পরিশ্রম করে বঞ্চিতের বেদনা ভার মাথায় নিয়ে সে এগিয়ে চলেছে! কিন্তু কী কঠিন, কী দুঃসহ তার প্রতিটি পদক্ষেপ। সে জানে না তার পথের শেষ কোথায়। তবু ক্লান্তিহীন রাত্রিদিন তাকে এগিয়ে যেতে হবে। তাই সে যাবে।

কমলেশ যখন থাকবে না তখন তার আর কিছু না থাক, হয়তো এই দুর্গম পথের কিনারে কিনারে থাকবে কঠিন পদক্ষেপের ছাপ। আর ভবিষ্যতে তার মতো অসংখ্য পদাতিক বিপুল উদ্যমে সুগম করে তুলবে আজকের হতাশ-শঙ্কুল বন্ধুর পথ।

না থাকুক কমলেশ সেদিন, ক্ষতি নেই। কিন্তু যারা থাকবে, স্ত্রীর চিকিৎসার কথা ভেবে তাদের কলমের গতি শ্লথ হবে না, মধ্যরাত্রে দপ দপ করবে না শিরা-উপশিরা।

তাদের উজ্জল দিনের কথা ভেবে আজ লিখতেই হবে কমলেশকে।

খুব ভোরে নীলিমা কমলেশের বাড়িতে আস্তে সদর দরজার কড়া নাড়লো। প্রতি রবিবার ভোরে কমলেশ নিজে দরজা খুলে নীলিমাকে ভেতরে নিয়ে যায়। আজ কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না কারোর। আবার একটু জোরে শব্দ করলো নীলিমা। একটু পরে সেই বাচ্চা চাকর ঘুম চোখে কোনো রকমে দরজা খুলে আবার শুয়ে পড়লো বারান্দায়।

পা টিপে টিপে নীলিমা সুলতার ঘরে চলে এলো। শীলা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সুলতারও ঘুম ভাঙেনি। কিন্তু কমলেশ কোথায়? সে তো বিছানা ছেড়ে উঠেছে। তাহলে কেন নীলিমাকে দরজা খুলে দিলো না?

সুলতার কপালে হাত দিয়ে শিউরে পিছিয়ে এলো নীলিমা। নিঃস্পন্দ দেহ সুলতার। কঠিন পাথরের মতো ঠাণ্ডা তার অঙ্গ।

নীলিমার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো। জীবনে আর কখনও তার এমন অবস্থা হয়নি। এখন কী করবে সে? কাকে ডাকবে? কেমন করে শীলার ঘুম ভাঙিয়ে একথা বলবে? কমলেশ কোথায়।

প্রায় টলতে টলতে সে অন্য ঘরে চলে এলো। টেবিলে মাথা দিয়ে কমলেশ ঘুমোচ্ছে। প্রসারিত তার ডান হাত। খোলা কলম গড়িয়ে কখন মাটিতে পড়েছে। অসংখ্য কাগজ ছড়িয়ে আছে ঘরের এপাশে ওপাশে—কালির সামান্য আঁচড় পড়েনি একটিতেও।

শীলার বুকভাঙা কান্না ভেসে এলো।